



সেপ্টেম্বর মাস: ধর্মহীনদের রালী মারীয়ার মাস
৮ সেপ্টেম্বর, কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩১ ৬ - ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মা মারীয়ার জন্মদিন:
জাগতিক মায়ের মধ্যস্থতায় অনুভব

সৃষ্টি উদ্যাপনকাল ২০২৬:
জীবনময় জালে নবায়িত হই

জলবায়ু পরিবর্তনের অদৃশ্য সংকট ও পরিণতি

৩৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী



প্রয়াত মারীয়া সরকার

মৃত্যু : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

স্বামী : প্রয়াত জেরোম সরকার

(প্রয়াত আন্তনী মন্তি গমেজ ও

প্রয়াত ম্যাগডালেনা গমেজ-এর মেজ কন্যা)

ধর্মপত্নী : লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা



মা, তোমাকে অজস্র প্রশংসা

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার (প্রয়াত)
কনিষ্ঠ পুত্র

কী অনিঃশেষ ঘুমিয়ে আছো, মা
আমি আর ঘুম ভাঙ্গাতে পারি না
তুমি আর একটি বারও সাড়া দাও না,
তুমি এমন সংজ্ঞাহীনা
কোথা থেকে এক স্বর্গীয় আভা এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে
তোমার অপ্রতিম মুখ
আমি চিত্রাপিতের মত দেখি ঐ মুখ
তুমি চলে যাচ্ছ, একথা ভাবতেই
বড় ভাঙ্গন ধরে বুকে
কী শোকাবহ এই বিসর্জন, মা
ভরা সংসার রেখে তুমি চলে যাচ্ছ
পরিত্রাতা খ্রিস্টের সম্মুখে
আর তো তুমি মরণাপন্ন রোগীদের নিয়ে
হাসপাতালে হাসপাতালে দৌড়াবে না
আর তো তুমি সবার জন্য প্রোটের সামনে দাঁড়িয়ে
একটানা প্রার্থনা করবে না।
তোমার সহজ-মধুর সম্বোধনটি কানের কাছে
বাজতে থাকবে।



ঘুম

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার (প্রয়াত)

এখন তাকে ঘুমাতে দাও
সেতো বহুদিন নিজের ঘুম মাটি করে
জাত শত্রুদের সংসার-গৃহস্থালি
গুছিয়ে দিয়েছে। নিজেকেই ক্রান্ত বিশ্রান্ত করেছে খালি।
শত্রু মিত্র ভেদ করেনি বলে বারে বারে ভুল করেছে, বারে বারে
ক্রুশাপিত যিশুর মত সহিতে হয়েছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ
বারে বারে লগুভগু হয়েছে তার নিজের বাগান।
তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ইতস্তত করেনি যে ফরিশীরা
তারা এখন তার প্রশংসা-গানে মুখরিত। পিলাত হাত ধোয়।
এই হ-য-ব-র-ল এর ভিতরে
তবু একটি অনির্বাক্য প্রতীকের মত উদ্ভাসিত হয় তার হৃদয়
এখন আমি তাকে কোন স্তুতি নিবেদন করবো না।
কারণ, আমি তো স্থির জানি
ঐ পবিত্র বেদীতে নিজেই নিঃশর্তে সমর্পণ করেছে সে,
তার বড় অপূর্ণ জীবন অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ভরেছে
মানুষের ভালোবেসে।
এখন তাকে ঘুমাতে দাও।
(বুয়েটের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের প্রকাশনা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

শোকাক্ত স্বজন

জন, বেবী, মারীয়া (কৃপা), হিউবার্ট (তীর্থ), তিমথী (অর্ঘ্য)
ফিলিপ, জয়া, এলেন ও এঞ্জেলা
মালা, মিঠু ও আর্থার।



সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সৃষ্টির যত্নে মারীয়ার মতো হই

প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত হয় 'সৃষ্টি উদযাপন কাল' (Season of Creation)। এ সময়ে প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য উপলব্ধি এবং পৃথিবীকে আমাদের সম্মিলিত 'সাধারণ গৃহ' হিসেবে যত্ন নেওয়ার একটি গভীর খ্রিস্টীয় আহ্বান শুনতে পাই। বুঝতে পারি বিশ্বসৃষ্টি আমাদের ভোগের বস্তু শুধু নয়, এটি ঈশ্বরের দান এবং আমাদের কাছে অর্পিত এক পবিত্র দায়িত্ব।

পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে আমরা দেখি, ঈশ্বর সৃষ্টি করে দেখলেন, 'তা অতি উত্তম।' সৃষ্টির প্রতিটি উপাদান-আকাশ, বাতাস, নদী, বৃক্ষ, পশুপাখি এবং মানুষ-সবই ঈশ্বরের সৃষ্টির অংশ। তাই প্রকৃতিকে ধ্বংস করা, নির্বিচারে সম্পদ আহরণ করা কিংবা শুধু ভোগের মানসিকতায় পৃথিবীকে ব্যবহার করা মূলত সৃষ্টিকর্তার দানের প্রতি অবহেলা। মনে রাখা ভালো মানুষ সৃষ্টির মালিক নয়; বরং সৃষ্টির একজন তত্ত্বাবধায়ক।

আজ পৃথিবী জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, নদী ও জলাশয় দূষণ, প্লাস্টিক বর্জ্য, জীবাশ্মের ক্ষয় এবং নানা পরিবেশগত সংকটে বিপর্যস্ত। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর। ফলে সৃষ্টি রক্ষার দায়িত্ব কেবল পরিবেশবিদদের নয়; এটি আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও নৈতিক দায়িত্বেরও অংশ। আমাদের জীবনযাপন, ভোগের অভ্যাস এবং দৈনন্দিন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রতি আমাদের দায়িত্বশীলতা প্রকাশ পেতে পারে।

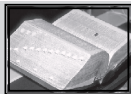
এই সৃষ্টি উদযাপন কালের সঙ্গে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আসে ধন্য কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব। মারীয়া শুধু যিশুর জননী নন; তিনি ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টির পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী এক অনন্য মানবী। তাঁর 'হ্যাঁ'-ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ সমর্পণ-মানবজাতির জন্য নতুন জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। তাই মারীয়াকে যথার্থই 'নবসৃষ্টির মাতা' হিসেবে ভাবা যায়। তাঁর জীবনে আমরা দেখি বিনয়, সরলতা, আনুগত্য, বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি।

মারীয়ার জন্মোৎসব আমাদের তাই একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়: আমরা কি নতুন সৃষ্টির মানুষ হতে চাই? যদি সত্যিই চাই, তাহলে আমাদের মন, পরিবার, সমাজ এবং পরিবেশ-সবকিছুর মধ্যেই নতুনত্বের বীজ বপন করতে হবে। ধ্বংসের পরিবর্তে নির্মাণ, অপচয়ের পরিবর্তে সংযম, ভোগের পরিবর্তে দায়িত্বশীলতা এবং উদাসীনতার পরিবর্তে যত্নের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

মারীয়ার প্রতি আমাদের ভক্তি যেন কেবল জপমালা প্রার্থনা কিংবা তীর্থযাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং তা যেন হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। ভেলেঙ্কিনির পবিত্র তীর্থস্থান শুধু মা মারীয়ার প্রতি ভক্তির কেন্দ্র নয়; এটি বিশ্বাস, আশা, নিরাময় ও ঈশ্বরের করুণার ওপর মানুষের আস্থারও এক গভীর প্রকাশ। মা মারীয়ার কাছে আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন তাঁর কাছে শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নয়, আমাদের আহত পৃথিবী, বিপন্ন প্রকৃতি, দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও প্রার্থনা করি।

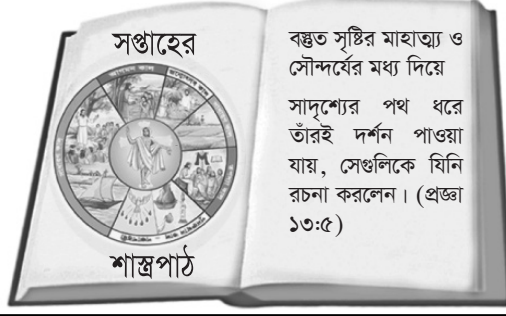
মারীয়ার মাতৃত্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয়-এই পৃথিবীও আমাদের যত্নের অপেক্ষায় থাকা ঈশ্বরের একটি মূল্যবান উপহার। একজন মা যেমন তাঁর সন্তানকে আগলে রাখেন, তেমনি আমরাও যেন পৃথিবীর প্রতি স্নেহ, মমতা ও দায়িত্বশীলতার আচরণ করি। সৃষ্টির যত্ন মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যত্ন; প্রকৃতির সুরক্ষা মানে মানুষের জীবন ও মর্যাদার সুরক্ষা।

সৃষ্টি উদযাপন কালের এই সময়ে তাই আসুন, আমরা একটি নতুন অঙ্গীকার করি-পৃথিবীকে শুধু ভোগ করব না, তাকে ভালোবাসব; শুধু সম্পদ নেব না, ফিরিয়েও দেব; শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করব না, তার ক্ষতও সারিয়ে তুলব। আর কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসবে তাঁকে 'নবসৃষ্টির মাতা' হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর মতো ঈশ্বরের ইচ্ছায় সাড়া দেওয়ার এবং সৃষ্টির যত্নে নিজেদের নিয়োজিত করার অনুপ্রেরণা গ্রহণ করি। †



তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মমতের অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। (মথি ৬:৩৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org



কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৬ সেপ্টেম্বর - ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার সাধারণকালের ২৩তম রবিবার (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-৩) সৃষ্টি পর্বদিবস (অবশ্য পালনীয়) প্রজ্ঞা ১৩: ১-৯; সাম ১৮: ২-৩, ৪-৫ অথবা সাম ১০৩: ১-২, ৫-৬, ১০ ও ১২, ২৪ ও ৩৫; কল ১: ১৫-২০; মথি ৬: ২৪-৩৪ (অথবা ৮: ২৩-২৭)
০৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার সাধারণকালের ২৩তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-৩) ১ করি ৫: ১-৮; সাম ৫: ৪-৬, ১১; লুক ৬: ৬-১১
০৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সাধারণকালের ২৩তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-৩) কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব, পর্ব পর্বদিবসের বাণীবিতান থেকে- মিখা ৫: ১-৪ (বিকল্প রোম ৮: ২৮-৩০); সাম ১৩: ৫-৬; মথি ১: ১-১৬, ১৮-২৩ (সংক্ষিপ্ত ১৮-২৩)
০৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার সাধারণকালের ২৩তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-৩) সাধু পিটার ক্রেভের, যাজক ১ করি ৭: ২৫-৩১; সাম ৪৫: ১০-১১, ১৩-১৬; লুক ৬: ১৭, ২০-২৬
১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সাধারণকালের ২৩তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-৩) ১ করি ৮: ১-৭, ১১-১৩; সাম ১৩৯: ১-৩, ১৩-১৪, ২৩-২৪; লুক ৬: ২৭-৩৮
১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সাধারণকালের ২৩তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-৩) ১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৭; সাম ৮৪: ২-৫, ৭, ১১; লুক ৬: ৩৯-৪২
১২ সেপ্টেম্বর, শনিবার সাধারণকালের ২৩তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-৩) মারীয়ার পরম পবিত্র নাম ১ করি ১০: ১৪-২২; সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৭-১৮; লুক ৬: ৪৩-৪৯ অথবা সাধু-সাধ্বীদের বাণীবিতান থেকে ইসা ৬১: ১০-১১; সাম লুক ১: ৪৬-৫৫; লুক ১: ৩৯-৪৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার + ১৯৮৫ ব্রা. আইতান সি. ডোলান, সিএসসি (ঢাকা) + ১৯৯৬ লরেট ডিক্সা, ওসিভি
০৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার + ২০১২ সি. মেরী বেনিগ্লা, এসএমআরএ (ঢাকা)
০৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার + ১৯৭৪ সি. এলিজাবেথ ও'ব্রায়েন, এসএমএসএম
১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার + ১৯২৬ সি.এম. এ্যান, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম) + ১৯৪২ সি. এম. আগস্টিন অব যীজাস, আরএনডিএম (ঢাকা)
১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার + ১৯৯১ ফা. আন্তোনিয় বনোলো, পিমে (দিনাজপুর) + ১৯৯৩ সি. এম. যোয়ান অফ আর্ক স্পেইটস, সিএসসি + ২০২০ ফা. রিচার্ড উইলিয়াম টিম, সিএসসি (ঢাকা)
১২ সেপ্টেম্বর, শনিবার + ১৯৬০ ফা. গডফ্রে ক্রিমেন্ট, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

সেপ্টেম্বর মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য :

পানির যত্নের জন্য প্রার্থনা করা

এসো আমরা প্রার্থনা করি: পানি ব্যবহারে এমন একটি ন্যায্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে প্রত্যেকে তা সমভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

পানি ঈশ্বরের সৃষ্টি। পানি বিশ্বের একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। পানি বা জলের অপর নাম জীবন। এতোটাই পানির গুরুত্ব! সবার জন্য সৃষ্ট এই পানি-সম্পদ। পানির কোন ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে মালিকানা নির্ধারণ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অথচ বৃহৎ বৃহৎ প্রায় সব নদীগুলোর উৎস কিন্তু ভারতসহ প্রতিবেশী অন্য দেশ থেকে। নদীগুলোর উৎস যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে বাংলাদেশ অনেকটা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তিস্তা নদীকে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। অতএব তিস্তা নদীর পানির ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক ন্যায্যতার নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য যে পরিমাণে পানির পরিমাণ থাকা উচিত তার চেয়ে অনেক কম হয়ে গেছে। নদী-খাল-বিল এবং পুকুর-ডোবা-জলাশয় ভরে যাচ্ছে বা ভরাট করা হচ্ছে প্রযুক্তির যুগে। যার প্রভাবে প্রকৃতির ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; মানুষের জীবনযাপনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া পানিদূষণ এমন একটি অবস্থায় চলে গেছে যে তা মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদজগতের অ-ব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়েছে, জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে, দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে বায়ু দূষণ বৃদ্ধি করছে।

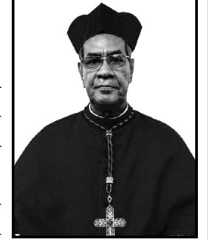
এ মাসে বিশেষভাবে আমরা প্রত্যেকে পানির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হই, পানির অপচয় ও দূষণ থেকে বিরত থাকি।

আমরা প্রার্থনা করি যেন বিশ্বের পানি-সম্পদ ব্যবহারে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হয় এবং আমাদের সবার বসত বাড়ি এই পৃথিবীর পানি ব্যবস্থাপনায় টেকসই ও যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ঈশ্বর আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১২ সেপ্টেম্বর, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ (অবসরপ্রাপ্ত) কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি-এর বিশপীয় পদাভিষেক বার্ষিকী। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।



- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। অক্টোবর জপমালা রাণী ও প্রেরণ কর্মের মাস এবং নভেম্বর পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস উপলক্ষে আপনাদের সৃষ্টিগত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ২ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এডিনউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

মা মারীয়ার জন্মোৎসব আমাদের বিশ্বাসের জীবন পথে চলার আহ্বান

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

“মা মারীয়ার জন্মদিন শুধু আনন্দের দিন নয়; এটি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও বিনয়ের পথে চলার আহ্বান।”

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে মা মারীয়া হলেন যিশু খ্রিস্টের পরম পবিত্র মাতা ও ঈশ্বরের অনুগত সেবিকা এবং আমাদের মা। তাঁর জীবন ছিল বিশ্বাস, বিনয়, পবিত্রতা, ত্যাগ ও ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর খ্রিস্টান সম্প্রদায় আনন্দ ও ভক্তির সঙ্গে মা মারীয়ার জন্মদিন বা ধন্যা মারীয়ার জন্মোৎসব পালন করে। এই দিনটি শুধু একজন মহান নারীর জন্মদিন নয়; বরং মানবজাতির মুক্তির ইতিহাসে ঈশ্বরের বিশেষ পরিকল্পনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। সম্ভাবনার আকুলতা নিয়ে মা মারীয়ার নিকট ব্যক্তিগণ আবদার, আবেদন, আকুত-মিনতি জানানো বিশেষ সময়।

পবিত্র বাইবেলে মা মারীয়ার জন্মের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী, তাঁর পিতা-মাতার নাম ছিলো যোয়াকিম ও আন্না। ঈশ্বরের বিশেষ পরিকল্পনায় মারীয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি ঈশ্বর পুত্র যিশু খ্রিস্টের মাতা হওয়ার মহান আহ্বান লাভ করেন। তাঁর জন্ম ছিল ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর জীবনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই: ঈশ্বর সাধারণ ও বিনয়ী মানুষকেও তাঁর মহান কাজে ব্যবহার করতে পারেন। “মা মারীয়া হলে সেই মা, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিজের জীবনের আনন্দ ও কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।”

মারীয়ার বিশ্বাস ও আনুগত্য: সাধু আগস্টিন বলেছেন যে, “মারীয়া ঈশ্বরের মা হওয়ার আগে বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রিস্টকে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।” মা মারীয়ার জীবনের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য। যখন মহাদূত গাব্রিয়েল তাঁকে জানানো যে তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে যিশুকে গর্ভধারণ করবেন, তখন মারীয়া বিনয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, “আমি প্রভুর দাসী; আপনার কথা অনুসারে আমার প্রতি ঘটুক।” (লুক ১:৩৮) এই বাক্যের মধ্যে তাঁর অসাধারণ বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা অনিশ্চয়তা ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখেছিলেন।

মারীয়ার বিনয়: মা মারীয়া ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। ঈশ্বর তাঁকে যিশুর মাতা হওয়ার মতো মহান মর্যাদা দিলেও তিনি কখনো অহংকার

করেননি। তাঁর Magnificat বা মহিমাম্বিত স্তবগানে তিনি ঈশ্বরের মহত্ত্ব ঘোষণা করেছেন এবং নিজের ক্ষুদ্রতার কথা স্মরণ করেছেন (লুক ১:৪৫)। তাঁর বিনয় আমাদের শিক্ষা দেয়-ঈশ্বরের কাছ থেকে যত বেশি আশীর্বাদ ও দায়িত্ব আমরা পাই, তত বেশি বিনয়ী হওয়া উচিত। মা মারীয়া আমাদের শেখায়- নীরব সেবা, বিনীত হওয়া, গভীর বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, হ্যাঁ বলা এবং বিপদের সময় তাঁকে স্মরণ করলে বা তাঁর নাম ডাকলে, তিনি কাউকে নিরাশ করবেন না।

মারীয়ার ত্যাগ ও কষ্ট: মা মারীয়ার জীবন শুধু আনন্দের ছিল না। যিশুর জন্ম থেকে শুরু করে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তিনি বহু কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি নিজের চোখের সামনে প্রিয় পুত্রের ক্রুশের যন্ত্রণা দেখেছেন। তবুও তিনি বিশ্বাস হারাননি। ক্রুশের নিচে তাঁর উপস্থিতি ছিল অসীম ভালোবাসা, সাহস ও বিশ্বাসের নিদর্শন।

আমাদের জন্য শিক্ষা: মা মারীয়ার জন্মদিন আমাদের জীবনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়; যেমন মারীয়া ছিলেন, তেমনি আমাদেরও ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁর মতো জীবনে বিনয় ও পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে ও দুঃখ-কষ্টের সময় ঈশ্বরকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। মারীয়ার মতো মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে এবং ঈশ্বরের আহ্বান পেলে সাহসের সঙ্গে তা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য ত্যাগ ও সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

মা মারীয়ার জন্মদিন পালন করার গুরুত্ব:

সেন্ট লুই দ্য মনফোর্ট বলেছেন যে, “মারীয়ার মাধ্যমে যিশুর কাছে যাওয়ার সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ পথ।” তাই এদিনে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা পবিত্র খ্রিস্টিয়াগে অংশগ্রহণ, প্রার্থনা, জপমালা প্রার্থনা এবং মারীয়ার গুণাবলী অনুসরণ করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে তাঁর জন্মদিন পালন করে। বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। তবে শুধু অনুষ্ঠান পালন করাই যথেষ্ট নয়; মারীয়ার মতো বিশ্বাসী, বিনয়ী, পবিত্র ও সেবাপরায়ণ জীবনযাপন করাই হলো এই উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

মা মারীয়াকে নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের উক্তি: মা মারীয়াকে নিয়ে অনেক সাধু ও খ্রিস্টীয় ব্যক্তিত্বের সুন্দর বাণী রয়েছে। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাণী বাংলা ভাবানুবাদে দেওয়া

হলো: সাধু আগস্টিন: “মারীয়া হলেন সেই নারী, যার মাধ্যমে পরিব্রাজকের পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে।” সাধু আলফ্রান্সো লিগুওরি: “মারীয়ার কাছে আশ্রয় নেওয়া মানে ঈশ্বরের মায়ের স্নেহময় হৃদয়ের কাছে আশ্রয় নেওয়া।” সাধু বার্নার্ড: “বিপদের সময় মারীয়ার কথা স্মরণ করো; তাঁর নাম ডাকো-তিনি তোমাকে নিরাশ করবেন না।” সেন্ট লুইস দ্য মনফোর্ট: “মারীয়ার মাধ্যমে যিশুর কাছে যাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ, সহজ ও সুন্দর পথ।” কলকাতার সাধী তেরেসা: “মারীয়ার মতো আমাদেরও ঈশ্বরের ভালোবাসার বাহক হয়ে অন্যদের কাছে পৌঁছাতে হবে।” পোপ ফ্রান্সিস: “মারীয়া আমাদের শেখান কীভাবে ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনতে হয় এবং বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আহ্বানে ‘হ্যাঁ’ বলতে হয়।” ক্ষুদ্রপুষ্প সাধী তেরেসা: “মারীয়া আমার কাছে দূরের কোনো রাণী নন; তিনি একজন মায়ের মতো, যার কাছে আমি সহজভাবে যেতে পারি।” উপরোক্ত বাণীগুলোর মূল শিক্ষা: মা মারীয়া হলেন বিশ্বাস, বিনয়, আনুগত্য, মাতৃস্নেহ ও ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদর্শ। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়-ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করে ভালোবাসা ও সেবার জীবন যাপন করতে।

মা মারীয়ার জন্মদিন আমাদের জন্য আনন্দ, আশা ও বিশ্বাসের উৎসব। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়-ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, বিনয়, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে একজন মানুষ ঈশ্বরের মহান কাজে অংশ নিতে পারে। তাই মা মারীয়ার জন্মদিনে আমরা যেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করি; তিনি যেন আমাদের যিশুর পথে চলতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে এবং মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে সাহায্য করেন। মা মারীয়ার জন্মদিনের শুভেচ্ছামূলক প্রার্থনা, “শুভ জন্মদিন, মা-মারীয়া। তোমার বিনয় আমাদের বিনয়ী করুক, তোমার বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাসী করুক, তোমার ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসতে শেখাক, তোমার ‘হ্যাঁ’ আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণে সাহস দিক ও তোমার সেবার মনোভাব আমাদের প্রকৃত সেবক করে তুলুক। মা মারীয়া আমাদের ও সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করো।” মা মারীয়া, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

- ❖ খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে “ঐশবাণীধ্যান”
- ❖ ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট
- ❖ পবিত্র বাইবেল
- ❖ বিশ্বাসের মানুষ

মা মারীয়ার জন্মদিন: জাগতিক মায়ের মধ্যস্থতায় অনুভব

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

“মা মারীয়া আমাদের মা
দেহগতভাবে নয় কিন্তু ভালবাসার মাধ্যমে”
- সাধু আলফন্স দে লিগোরি

আমাদের জীবনে মা শব্দটির মতো আপন কোন শব্দ মনে হয় অভিধানে নেই। আমি যতবার মা বলে আমার জননীকে ডাকি ততবারই আমি মুগ্ধ বিমোহিত হই। আমার দুইজন মা একজন জন্মদাতা আরেকজন ভালবাসার গুণে তিলে তিলে গড়ে উঠা স্বর্গীয়া আশীর্বাদ। পল্লবী মারীয়া রোজারিও আমার জীবনে মায়ের স্থান দখলকারী অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব। মা মারীয়ার জন্মদিনের পালনের শুভক্ষণে আসলে আমি বারবারই আমার জাগতিক মায়ের কথা খুব করে স্মরণ করছি কারণ তাদের মধ্য দিয়েই আসলে আমরা স্বর্গীয়া মাকে অনুভব করি। আমার জন্মদাত্রী মা এবং ঈশ্বরের দেওয়া উপহারের ভিন্নমাত্রার একজন মা যাদের ভালবাসা, মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ অনুভব করায় মা মারীয়ার বিশেষ অনুগ্রহ। মানবজীবনের সবচেয়ে কোমল, পবিত্র ও গভীর সম্পর্কগুলোর মধ্যে মা ও সন্তানের সম্পর্ক অন্যতম। পৃথিবীতে এমন কোনো শব্দ হয়তো নেই, যা উচ্চারণ করলেই হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিগুলো এত সহজে জেগে ওঠে, যতটা ওঠে ‘মা’ শব্দটি শুনলে। মা মানেই আশ্রয়, স্নেহ, ত্যাগ, ক্ষমা, নিরাপত্তা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। একজন সন্তান যখন জীবনের দুঃখে ভেঙে পড়ে, তখন সে মায়ের কাছে শান্তি খোঁজে; যখন আনন্দে উদ্বেলিত হয়, তখন সেই আনন্দ প্রথম ভাগ করে নিতে চায় মায়ের সঙ্গে। তাই মা কেবল একজন ব্যক্তি নন-তিনি সন্তানের জীবনের এক নিরাপদ আশ্রয়, এক অনন্ত ভালোবাসার প্রতীক। কিন্তু খ্রিস্টীয় বিশ্বাস আমাদের শেখায়, জাগতিক জীবনের এই মাতৃস্নেহের মধ্যেও আমরা আরও গভীর এক স্বর্গীয় ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি দেখতে পারি। আমাদের পৃথিবীর মায়ের মধ্যস্থতায় আমরা অনুভব করতে পারি আমাদের স্বর্গীয়া মা, ধন্য কুমারী মারীয়াকে। তিনি যিশু খ্রিস্টের মা, কিন্তু ক্রুশের পাদদেশে যিশু তাঁকে সমগ্র মানবজাতিরও মা হিসেবে আমাদের কাছে অর্পণ করেছেন। তাই মা মারীয়ার জন্মদিন কেবল একজন মহান নারীর জন্ম স্মরণ নয়; এটি মাতৃত্ব, ভালোবাসা, বিশ্বাস, বিনিয় এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের এক মহোৎসব। প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বর আমরা মা মারীয়ার জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে গিয়ে এই মূলসুরকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, “জাগতিক মায়ের মধ্যস্থতায় স্বর্গীয়া মাকে

অনুভব।” পৃথিবীতে মায়ের স্নেহ, ত্যাগ, প্রার্থনা ও মমতার মধ্যে আমরা যেন মারীয়ার মাতৃত্বের এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। আর মা মারীয়ার জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা যেন আমাদের জাগতিক মাকে আরও গভীরভাবে ভালোবাসতে, সম্মান করতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শিখি।

মা: ঈশ্বরের ভালোবাসার দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি

ঈশ্বর অদৃশ্য, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মানুষের মধ্য দিয়ে। একজন মা তার অন্যতম সুন্দর উদাহরণ। একটি শিশু পৃথিবীতে আসার আগেই মায়ের শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জন্মের পর মায়ের কোলই হয়ে ওঠে তার প্রথম পৃথিবী। মায়ের কর্ণ তার প্রথম সঙ্গীত, মায়ের মুখ তার প্রথম পরিচিত আলো, আর মায়ের স্পর্শ তার প্রথম নিরাপত্তা। একজন মা সন্তানের জন্য কত কিছু করেন, তার হিসাব করা সম্ভব নয়। সন্তান অসুস্থ হলে মা নিরুন্ম রাত কাটান; সন্তান ক্ষুধার্ত হলে নিজের অংশটুকু দিয়েও তাকে খাওয়ান; সন্তান বিপদে পড়লে নিজের জীবন বিপন্ন করতেও পিছপা হন না। অনেক সময় সন্তান মাকে কষ্ট দেয়, অবহেলা করে, ভুল বোঝে-তবুও মায়ের ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় না। এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঈশ্বরের প্রেমকে। একজন জাগতিক মা যেমন সন্তানের ব্যথা নিজের হৃদয়ে ধারণ করেন, তেমনি মা মারীয়া আমাদের জীবনের আনন্দ-বেদনা, ভয়-আশা এবং অশ্রু নিজের মাতৃহৃদয়ে ধারণ করেন। তাই জাগতিক মায়ের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গীয়া মায়ের ভালোবাসার স্বাদ পেতে পারি। পৃথিবীর মা সীমাবদ্ধ; তিনি ক্লান্ত হন, অসুস্থ হন, কখনো দূরে থাকেন এবং একসময় পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু স্বর্গীয়া মা মারীয়ার মাতৃত্ব সীমাবদ্ধ নয়। তিনি আমাদের সকল অবস্থায় তাঁর মাতৃস্নেহে আগলে রাখেন। তাই পৃথিবীর মায়ের হাত ধরে আমরা স্বর্গীয়া মায়ের কাছে যেতে পারি।

মা মারীয়ার জন্ম: মানবজাতির জন্য নব আশার সূচনা

মা মারীয়ার জন্মদিন খ্রিস্টীয় জগতে এক বিশেষ আনন্দের দিন। তাঁর জন্মের মধ্য দিয়ে মানবজাতির ইতিহাসে নতুন আশার আলো উদিত হয়েছিল। মারীয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। তাঁর জীবন ছিল সেই মহান পরিকল্পনার প্রস্তুতি, যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টকে পৃথিবীতে পাঠাবেন। মারীয়া ছিলেন সাধারণ

এক তরুণী। তাঁর জন্ম ছিল কোনো রাজপ্রাসাদে নয়, তাঁর জীবনে ছিল না বাহ্যিক ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য। অথচ ঈশ্বর তাকেই বেছে নিয়েছিলেন মুক্তিদাতার মা হওয়ার জন্য। এখানেই আমরা ঈশ্বরের কাজের এক আশ্চর্য রহস্য দেখতে পাই-ঈশ্বর অনেক সময় পৃথিবীর চোখে ছোট ও সাধারণ মানুষকেই তাঁর মহান পরিকল্পনার অংশ করে নেন। মারীয়ার জন্ম আমাদের শেখায় যে, প্রতিটি মানবজীবন ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান। প্রতিটি শিশুর জন্মের মধ্যেই একটি সম্ভাবনা আছে, একটি আশ্বাস আছে, একটি ঈশ্বরপ্রদত্ত উদ্দেশ্য আছে। মা মারীয়ার জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে গিয়ে তাই আমরা সকল মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ একজন মা নতুন জীবনকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মে সহযোগী হয়ে ওঠেন। মারীয়ার জন্মের আনন্দ তাই কেবল অতীতের একটি স্মৃতি নয়। এটি আজও আমাদের হৃদয়ে নতুন আশা জাগায়। অন্ধকার যত গভীরই হোক, ঈশ্বর তাঁর আলো পাঠান। হতাশা যত প্রবলই হোক, ঈশ্বর নতুন জীবনের পথ খুলে দেন। মারীয়ার জন্ম সেই নতুন ভোরের মতো, যা ধীরে ধীরে মানবজাতিকে খ্রিস্টের আগমনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

জাগতিক মায়ের মধ্যে মা মারীয়ার প্রতিচ্ছবি

আমাদের জীবনের জাগতিক মায়েরা পরিপূর্ণ নন। তারাও মানুষ; তাদেরও দুর্বলতা, ক্লান্তি ও সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু তারপরও একজন মায়ের হৃদয়ে এমন এক ভালোবাসা থাকে, যা ঈশ্বরীয় ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন মা সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন, তখন আমরা মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় প্রার্থনার কথা ভাবতে পারি। যখন মা সন্তানের ভুল ক্ষমা করে দেন, তখন আমরা মারীয়ার কোমল হৃদয়ের কথা অনুভব করতে পারি। যখন মা সন্তানের বিপদে উদ্বিগ্ন হন, তখন আমরা ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বেদনাময়ী মা মারীয়ার কথা স্মরণ করি। মা মারীয়া তাঁর পুত্র যিশুর জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন। বেথলেহেমের গোয়ালঘরে তিনি শিশু যিশুকে কোলে নিয়েছিলেন। মিশরে পালিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সন্তানের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। নাজারেথে তিনি যিশুকে লালন-পালন করেছেন। কানা নগরে বিয়েতে তিনি মানুষের প্রয়োজন লক্ষ্য করেছিলেন এবং যিশুর কাছে সুপারিশ করেছিলেন। আর কালভারীর ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর পুত্রের অসহনীয় যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে আমরা একজন মায়ের

পূর্ণ জীবন দেখতে পাই-আনন্দ আছে, দুঃখ আছে, ভয় আছে, আশা আছে, কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই আছে অটল ভালোবাসা ও বিশ্বাস। আমাদের জাগতিক মায়ের জীবনেও কি আমরা এমন ছবি দেখি না? তিনি সন্তানের হাসিতে আনন্দিত হন, কান্নায় ব্যথিত হন, সাফল্যে গর্বিত হন, ব্যর্থতায় সন্তুষ্ট হন। সন্তানের জন্য তাঁর প্রার্থনা কখনো শেষ হয় না। তাই আমরা যখন আমাদের মায়ের মুখের দিকে তাকাই, তাঁর ত্যাগ স্মরণ করি, তাঁর ভালোবাসা অনুভব করি, তখন সেই অনুভূতির মধ্য দিয়েই আমরা স্বর্গীয়া মা মারীয়ার ভালোবাসার একটি আভাস পেতে পারি।

মা মারীয়ার মাতৃত্ব: সকল মানুষের জন্য

ক্রুশের উপর যিশুর শেষ মুহূর্তগুলোর একটি অত্যন্ত গভীর ঘটনা হলো, তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, “এই তোমার মা।” আর তাঁর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, “এই তোমার পুত্র।” এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মারীয়ার মাতৃত্ব একটি নতুন ও সার্বজনীন অর্থ লাভ করে। মারীয়া কেবল যিশুর জৈবিক মা হয়ে থাকেননি; তিনি হয়ে উঠেছেন বিশ্বাসীদের মা। আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। তাই আমাদের দুঃখ তাঁর কাছে বলা যায়, আমাদের ভয় তাঁর কাছে তুলে ধরা যায়, আমাদের দুর্বলতা নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। একজন ভালো মা যেমন সন্তানের কথা শুনতে কখনো বিরক্ত হন না, মা মারীয়াও আমাদের প্রার্থনা ও আকুতিকে অবহেলা করেন না। তিনি আমাদের হয়ে তাঁর পুত্র যিশুর কাছে তা তুলে ধরেন। কানান নগরে বিয়ের ঘটনা আমাদের এই সত্যটি সুন্দরভাবে দেখায়। সেখানে মানুষ যখন সমস্যায় পড়েছিল, মারীয়া তাদের প্রয়োজন বুঝেছিলেন এবং যিশুর কাছে বলেছিলেন। আমাদের জীবনেও কত “দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়ার” মুহূর্ত আসে! কখনো আনন্দ শেষ হয়ে যায়, কখনো আশা ফুরিয়ে যায়, কখনো সাহস হারিয়ে ফেলি, কখনো সম্পর্ক ভেঙে যায়, কখনো জীবনের পথ অন্ধকার মনে হয়। সেই মুহূর্তে আমরা মারীয়ার কাছে যেতে পারি। তিনি আমাদের সমস্যার দিকে তাকিয়ে তাঁর পুত্রের দিকে নির্দেশ করেন। এটাই সত্যিকারের মারীয়া ভক্তির সৌন্দর্য-মারীয়া কখনো আমাদের নিজের কাছে আটকে রাখেন না; তিনি সবসময় আমাদের যিশুর দিকে নিয়ে যান। তাঁর জীবন যেন সর্বদা একটি বাক্য উচ্চারণ করে: “তিনি যা বলেন, তা-ই করো।”

জাগতিক মায়ের নীরব ত্যাগ ও মারীয়ার নীরবতা

আজকের পৃথিবী শব্দে ভরা। সবাই কথা বলতে চায়, নিজের সাফল্য প্রচার করতে চায়, নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু

মা মারীয়ার জীবনে আমরা দেখি এক গভীর নীরবতা। তিনি ঈশ্বরের অসাধারণ পরিকল্পনার অংশ হয়েও নিজেকে বড় করে দেখাননি। তিনি অলৌকিক ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েও অহংকার করেননি। তিনি অনেক কথা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। জাগতিক মায়ের জীবনেও আমরা এই নীরব ত্যাগ দেখতে পাই। একজন মা অনেক সময় নিজের কষ্ট কাউকে বলেন না। সন্তান যেন ভালো থাকে, এই চিন্তায় তিনি নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দেন। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য নিজের স্বপ্ন ত্যাগ করেন। তাঁর শ্রমের অনেকটাই চোখে পড়ে না, তাঁর অশ্রুর অনেকটাই কেউ দেখে না। মা মারীয়ার জন্মদিনে আমরা এই নীরব মায়ের স্মরণ করতে পারি। যারা সন্তানদের জন্য সংগ্রাম করছেন, যারা অভাবের মধ্যেও সন্তানকে মানুষ করছেন, যারা অসুস্থ হয়েও পরিবারের জন্য কাজ করছেন, যারা দূরে থেকেও সন্তানের জন্য প্রার্থনা করছেন-তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমরা মারীয়ার মাতৃত্বের একটি প্রতিচ্ছবি দেখতে পারি। তাই মাকে সম্মান করা কেবল একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়; এটি গভীর আধ্যাত্মিক দায়িত্বও। যে সন্তান মায়ের ত্যাগকে বুঝতে শেখে, সে ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকেও আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

জাগতিক মাকে ভালোবাসার মাধ্যমে মা মারীয়াকে সম্মান

অনেক সময় আমরা মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করি, কিন্তু আমাদের নিজেদের মায়ের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হই না। এটি একটি বড় আত্মিক প্রশ্ন। স্বর্গীয়া মাকে ভালোবাসার দাবি তখনই পূর্ণতা পায়, যখন আমরা পৃথিবীর মাকেও সম্মান করতে শিখি। যদি আমাদের মা জীবিত থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে কথা বলা, তাঁর খোঁজ নেওয়া, তাঁর কষ্ট বোঝা, তাঁর জন্য সময় দেওয়া, এসবই আমাদের ভালোবাসার প্রকাশ হতে পারে। শুধুমাত্র বিশেষ দিনে উপহার দিলেই মাতৃভক্তি সম্পূর্ণ হয় না; প্রতিদিনের আচরণে মায়ের প্রতি সম্মান প্রকাশ করতে হয়। আর যাদের মা পৃথিবীতে নেই, তাঁরা হতাশ হবেন না। মা মারীয়া বিশেষভাবে তাঁদেরও মা। পৃথিবীর মায়ের শূন্যতা হয়তো কখনো সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু মারীয়ার মাতৃ হৃদয়ে আমরা আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারি। জাগতিক মাকে ভালোবাসা এবং স্বর্গীয়া মাকে সম্মান করা-এই দু'টি একে অপরের বিরোধী নয়। বরং একটি অন্যটিকে গভীর করে। পৃথিবীর মায়ের ভালোবাসা আমাদের শেখায় কীভাবে ভালোবাসতে হয়, আর মারীয়ার ভালোবাসা আমাদের শেখায় সেই ভালোবাসাকে যিশুর দিকে পরিচালিত করতে।

মা মারীয়ার কাছ থেকে বর্তমান সময়ের মায়ের শিক্ষা

আজকের পৃথিবীতে মায়ের ভূমিকা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক চাপ, সামাজিক পরিবর্তন, প্রযুক্তির প্রভাব, পারিবারিক সংকট, সবকিছুর মধ্যে একজন মা সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। এই সময়ে মারীয়া আধুনিক মায়ের জন্য এক অনন্য আদর্শ। প্রথমত, তিনি বিশ্বাসের মা। সন্তানকে শুধু ভালো শিক্ষা বা সুন্দর ভবিষ্যৎ দিলেই যথেষ্ট নয়; তাকে ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করাও প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, তিনি প্রার্থনার মা। একজন মা সন্তানের জন্য যত পরিকল্পনাই করুন না কেন, প্রার্থনা ছাড়া জীবনের পথ পূর্ণতা পায় না। তৃতীয়ত, তিনি বিনয়ের মা। তিনি মহান আহ্বান পেয়েও নিজেকে কখনো বড় করে দেখাননি। চতুর্থত, তিনি সাহসের মা। জীবনের অনিশ্চয়তা ও দুঃখের মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের প্রতি আস্থা হারাননি। পঞ্চমত, তিনি উপস্থিতির মা। তিনি সবসময় মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সচেতন ছিলেন। কানা নগরে বিয়েতে অন্যদের প্রয়োজন লক্ষ্য করা তাঁর মাতৃসুলভ হৃদয়ের পরিচয়। আধুনিক পৃথিবীর প্রতিটি মা যদি মারীয়ার এই গুণগুলো থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেন, তবে পরিবার আরও সুন্দর, শান্তিময় ও বিশ্বাসভিত্তিক হয়ে উঠতে পারে।

তরুণ প্রজন্মের জন্য মারীয়ার জন্মদিনের আহ্বান

মা মারীয়ার জন্মদিন তরুণদের কাছেও একটি বিশেষ আহ্বান বহন করে। আজকের তরুণ প্রজন্ম স্বাধীনতা চায়, স্বপ্ন দেখে, নিজের পরিচয় খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এই পথ চলার মধ্যে অনেক প্রলোভন, বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা রয়েছে। মারীয়া তরুণী বয়সেই ঈশ্বরের মহান আহ্বান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সামনে সবকিছু পরিষ্কার ছিল না। তিনি জানতেন না ভবিষ্যতে কী ঘটবে। তবুও তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন। এখানেই তরুণদের জন্য মারীয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষা সব উত্তর জানা না থাকলেও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা যায়। আজ আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ হই-কী হবে, কোথায় যাব, সফল হব কি না, জীবনের উদ্দেশ্য কী? এই প্রশ্নগুলো স্বাভাবিক। কিন্তু মারীয়া আমাদের শেখান, ঈশ্বরের পরিকল্পনার ওপর বিশ্বাস রেখে এক ধাপ করে এগিয়ে যেতে। তরুণদের উচিত মারীয়ার কাছে নিজেদের জীবন সমর্পণ করা এবং বলা, “মা, আমাকে তোমার পুত্রের পথে পরিচালিত করো।” কারণ মারীয়ার কাছে যাওয়া মানে যিশুর কাছেই যাওয়া।

মাতৃত্বের সার্বজনীন ভাষা

মাতৃত্ব কোনো ভাষা, জাতি বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর সব সংস্কৃতিতেই মা ভালোবাসা ও আশ্রয়ের প্রতীক। একজন মায়ের চোখের জল, হাসি, উদ্বেগ এবং সন্তানের জন্য প্রার্থনা—এসবের ভাষা বিশ্বজনীন। এই সার্বজনীন মাতৃত্বের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক প্রতীক মা মারীয়া। তিনি শুধু একটি জাতির মা নন; তিনি সমগ্র বিশ্বাসী মানবজাতির মা। তাই মা মারীয়ার জন্মদিনে আমরা শুধু কাথলিক ভক্তির একটি অনুষ্ঠান পালন করি না; আমরা মানবতার এক গভীর সত্য উদযাপন করি। যখন একজন মা ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেন, সেখানে আমরা মাতৃত্ব দেখি। যখন একজন মা সারারাত জেগে অসুস্থ সন্তানের সেবা করেন, সেখানে আমরা মাতৃত্ব দেখি। যখন একজন মা সন্তানের ভুলের পরও তাকে গ্রহণ করেন, সেখানে আমরা মাতৃত্ব দেখি। আর এই সব ভালোবাসার মধ্যে আমরা স্বর্গীয়া মায়ের ভালোবাসার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

মারীয়ার জন্মদিনে আমাদের কৃতজ্ঞতা

আজ মা মারীয়ার জন্মদিনে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠুক। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তিনি মানবজাতিকে এমন একজন মা দিয়েছেন, যিনি আমাদের যিশুর কাছে নিয়ে যান। আমরা আমাদের জাগতিক মায়ের জন্যও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। হয়তো তিনি নিখুঁত নন, হয়তো তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সবসময় সহজ ছিল না, হয়তো আমরা তাঁকে অনেকবার বুঝতে পারিনি—তবুও তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা কোনো না কোনোভাবে ভালোবাসা পেয়েছি। আজকের দিনে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি—

- আমি কি আমার মায়ের ত্যাগের মূল্য বুঝি?
- আমি কি তাঁর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলি?
- আমি কি তাঁর জন্য প্রার্থনা করি?
- আমি কি তাঁর কষ্টের সময় পাশে দাঁড়াই?
- আমি কি মা মারীয়ার মতো বিনয়ী ও বিশ্বাসী হতে চেষ্টা করি?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের আত্মিক জীবনকে আরও গভীর করতে পারে। মা মারীয়াকে সম্মান করার সবচেয়ে সুন্দর উপায় কেবল ফুল, মোমবাতি বা বাহ্যিক আয়োজন নয়; তাঁর গুণগুলোকে জীবনে ধারণ করা। তাঁর মতো ঈশ্বরের প্রতি “হ্যাঁ” বলা, তাঁর মতো বিনয়ী হওয়া, তাঁর মতো অন্যের প্রয়োজন লক্ষ্য করা এবং তাঁর মতো দুঃখের সময়েও বিশ্বাস ধরে রাখা—এগুলোই প্রকৃত মারীয়া ভক্তির প্রকাশ।

মা মারীয়ার জন্মদিন আমাদের হৃদয়ে আনন্দের এক অতীব পবিত্র উপলক্ষ। তাঁর জন্মের মাধ্যমে মানবজাতির মুক্তির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের নির্বাচিতা কন্যা, যিশুর মা এবং আমাদের সকলের স্বর্গীয়া মা। আমাদের জাগতিক মায়ের স্নেহের মধ্যে আমরা তাঁর মাতৃত্বের একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। পৃথিবীর মা যখন আমাদের কোলে নেন, আমরা আশ্রয় অনুভব করি; মারীয়ার কাছে গেলে আমরা আত্মিক আশ্রয় পাই। জাগতিক মা যখন আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, তখন আমরা স্বর্গীয়া মায়ের মধ্যস্থতার কথা স্মরণ করি। জাগতিক মা যখন আমাদের ব্যর্থতায় পাশে থাকেন, তখন আমরা ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মারীয়াকে স্মরণ করি।

“সন্তান যদি তার মায়ের অনুগ্রহ পেতে চায়

তবে সে যেন তার মায়ের অনুকরণ করার চেষ্টা করে”

- সাধু বার্গাড

(৯ পৃষ্ঠার পর)

রকম স্মারকচিহ্ন, মা মারীয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিভিন্ন ভাষায় লেখা চিঠি-পত্র, মা মারীয়াকে দেওয়া স্বর্ণ দিয়ে তৈরী মূর্তি, আংটি কিংবা মুকুট প্রভৃতি। সারা রুম জুড়েই রয়েছে মা মারীয়ার প্রতি তাদের ভালবাসা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর স্মারকচিহ্ন। সেগুলো না দেখলে জানাই হত না মারীয়ার প্রতি তাদের বিশ্বাস-ভক্তি, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধ কতটা গভীর। শুধু তাই নয়, তাদের উদারতাও দেখার মত। মা মারীয়ার নামে উদারচিত্তে মানত, দান, ফুল, নারিকেল, শাড়ী, মোমবাতি প্রভৃতি দেন তারা। অনলাইন ও অফলাইনে দুইভাবেই দান, মানত ও খ্রিস্টিয়াদের উদ্দেশ্য দেওয়ার সুব্যবস্থাও রয়েছে।

ভেলেক্সিনি মা মারীয়ার তীর্থস্থান ভারত উপমহাদেশের সকল রোগীদের শেষ আশ্রয়স্থল। খ্রিস্টান ছাড়াও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, মুসলিমসহ সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষ এইখানে আরোগ্য লাভের আশায় মা মারীয়ার নিকটে আসেন। তাদের বিশ্বাস দেখে অবাক হতে হয়। বালুকাময় রাস্তা যা ‘পবিত্র পথ’ বলে পরিচিত তা দিয়ে রোগীরা হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে করতে নির্দিষ্ট পথ পাড়ি দেন শুধু মাত্র মা মারীয়ার অনুগ্রহ লাভে আশায় ও আরোগ্য লাভের আশায়। তাদের বিশ্বাস ও ভক্তি সত্যি অনুপ্রাণিত করে। সেই বালুকাময় রাস্তার আশে পাশেই তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, পাপস্বীকার করার ব্যবস্থা, আরাধনার জন্য চ্যাপেল, মর্নিং স্টার গির্জা, আওয়ার লেডি অব ট্যাংক গির্জা, নির্জনধ্যানের জন্য ব্যবস্থা ও বিবাহ সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে পরামর্শের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পথ চলতে চলতে দেখলাম, খোলা আকাশের নিচে নিজেদের মত করেই তারা রাত্রিযাপন করে। কেউ কেউ নিজেরাই রান্না করে খায়। খাওয়া-দাওয়া কিংবা থাকার বিষয়ে তাদের দুশ্চিন্তা নেই। তাদের দেখলে মনে হবে তারাই সত্যিকারের বিশ্বাসী ও তীর্থযাত্রী। (চলবে)

মা-মারীয়ার জন্মতিথি ও সেনাসংঘ দিবস

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার মা মারীয়ার জন্মতিথি ও ‘সেনাসংঘ দিবস’। মা-মারীয়ার জন্মদিন মারীয়ার সেনাসংঘের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই বাংলাদেশের সকল সেনাসংঘের সদস্য-সদস্যা ভাইবোনদের যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য ঢাকা কমিশিয়ামের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।



মা মারীয়ার জন্মদিন ও সেনাসংঘ দিবস সকলের জন্য বয়ে আনুক শান্তি সমৃদ্ধি ও মা মারীয়ার আশীর্বাদ।

ধন্যবাদান্তে,

ঢাকা কমিশিয়ামের সকল

সদস্য-সদস্যাব্দ

ঢাকা, বাংলাদেশ

বিঃদ্র: প্রত্যেক প্রেসিডিউম একত্রে তাদের সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে আনন্দের সাথে মা মারীয়ার শুভ জন্মদিন উদযাপন করবেন।

সুস্বাস্থ্যের জননী ভেলেঙ্কিনির মারীয়া

ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি

দক্ষিণভারত বিশ্বাসীদের এক তীর্থভূমি বিশেষ করে তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্ণাটক রাজ্যগুলো সকল বিশ্বাসীদের এক তীর্থভূমি। খ্রিস্টানদের জন্য প্রসিদ্ধ ও পবিত্র স্থানগুলো হল ভেলেঙ্কিনির মা মারীয়ার ব্যাসিলিকা, মাইলাপুরের সাধু টমাসের গির্জা ও সমাধি মন্দির এবং সাধু টমাসের প্রেরণকর্মের পবিত্র স্থানসমূহ, কেরেলায় সাধু টমাসের প্রথম বাণীপ্রচার ও সেবাকাজের স্থান, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের বাণীপ্রচারের স্থান কন্যাকুমারী প্রভৃতি। এ বছর অর্থাৎ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থান ভেলেঙ্কিনিতে গিয়েছিলাম। ভেলেঙ্কিনি মা মারীয়ার পর্ব প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর পালিত হয় মা মারীয়ার জন্মদিনে। ২৯ আগস্ট মহাসমারোহে নভেনার প্রথম দিন খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ মা মারীয়ার নামে পতাকা উত্তোলন করেন এবং প্রতি নভেনার সময় গাড়িতে মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে ব্যাসিলিকায় প্রবেশ করেন। তারপর ৮ সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে মা মারীয়ার পর্বোৎসব পালন করেন। ভেলেঙ্কিনির মা মারীয়াকে সুস্বাস্থ্যের জননী বলা হয় (Our Lady of Good Health)।

তামিলনাড়ু রাজ্যের ভেলেঙ্কিনি শহরটি রাজধানী শহর চেন্নাই (পূর্ব নাম মাদ্রাজ বা মাইলাপুর) শহর থেকে প্রায় ৩৩২ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। এই সমুদ্র তীরেই গড়ে উঠেছে ভেলেঙ্কিনি মারীয়ার নামে পরিচিত ব্যাসিলিকা। যাকে পূর্বদেশের লুর্দ নগরীও বলা হয়। এই ভেলেঙ্কিনি মারীয়ার ব্যাসিলিকা এক তীর্থভূমি। এই তীর্থভূমিটি ভারত উপমহাদেশের সকল মানুষের তীর্থভূমি বিশেষ করে রোগীদের জন্য এক আশার তরী, এক আশার প্রদীপ ও শেষ আশ্রয়স্থল।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে ভেলেঙ্কিনিতে মা মারীয়া প্রথম দর্শন দান করেন স্থানীয় এক রাখালের কাছে। একদিন এই রাখাল ভেলেঙ্কিনি থেকে নাগাপাট্টিনাম নামক স্থানের দিকে রওনা হচ্ছিলেন তার মালিকের কাছে দুধ পৌঁছে দেওয়ার জন্য। পথিমধ্যে এক পুকুরের পাশে অবস্থিত বট বৃক্ষের নিচে প্রচণ্ড গরমে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিশ্রাম নিতে গিয়ে তিনি হঠাৎ চোখ বন্ধ করে বিমিয়ে পড়ছিলেন। আর সেই সময়ই তিনি মা মারীয়ার দর্শন পান। এক অপরিচিত নারী তার বুকে থাকা শিশুর জন্য রাখালের নিকট দুধ যাচনা করেন। রাখালটিও বিলম্ব না করে শিশুর জন্য দুধ দিয়ে দেন।

তারপর রাখালটি উঠে মালিকের কাছে তার দেবী হওয়ার জন্য ও দুধ কম হওয়ার জন্য ক্ষমা যাচনা করেন। কিন্তু মালিক রাখালের কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। মালিক রাখালের সঙ্গে অশোভন আচরণ করতে শুরু করেন। তখনই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। মালিক দেখতে পেলেন দুধ পাত্র বেয়ে উপচে পড়ছে। মালিক তখন বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। মালিক রাখালের সঙ্গে সেই স্থানে গেলেন। মা মারীয়া আবার সেই রাখালকে দর্শন দেন কিন্তু রাখালের সেই মালিক উজ্জ্বল আলো দেখতে পেয়েছিলেন বটে তবে মা মারীয়াকে দেখতে পাননি। এই স্থানটিকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় মাথা কুলাম অর্থাৎ মা মারীয়ার পুকুর। এই স্থানটি ব্যাসিলিকা থেকে কয়েকশ গজ দূরে অবস্থিত। ব্যাসিলিকায় যাবার সময় প্রবেশ পথের ডান দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন একটি বালুকাময় রাস্তা। যাকে বলা হয় 'পবিত্র পথ' কারণ এই বালুময় রাস্তার উপর হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে করতে রোগীরা ও তীর্থযাত্রীরা মা মারীয়ার পুকুরের দিকে যান আরোগ্য লাভের আশায়। সেখানে পৌঁছে তারা তাদের মনোবাসনা লিখে রেখে আসেন কিংবা বটবৃক্ষে ঝুলিয়ে রেখে আসেন।

প্রথম দর্শনের কয়েকবছর পর মা মারীয়া আবার নাড়ু থিট্টু নামক স্থানে এক গরীব বিধবার খোঁড়া ছেলেকে দর্শন দেন। বর্তমান যে স্থানে ব্যাসিলিকা নির্মাণ করা হয়েছে সেইস্থানে। এই ছেলেটি বটতলায় ঘোল বা মাঠা বিক্রি করত। একদিন এক অনিন্দ্য সুন্দরী নারী তাকে দেখা দিয়ে তার শিশুর জন্য মাঠা যাচনা করেন। বালকটিও ঐ শিশুর জন্য মাঠা দিয়ে দেন। তারপর সেই নারী নির্দেশ দেন নাগাপাট্টিনাম নামক স্থানের এক ধনী লোকের কাছে যেতে এবং তাকে বলতে তিনি যেন এখানে একটা চ্যাপেল বা গীর্জিকা নির্মাণ করেন। খোঁড়া বালকটি তখনই সুস্থতা অনুভব করেন। তার পায়ে শক্তি ফিরে পান। তখনই ছেলেটি দৌড়ে ধনী লোকের কাছে ছুটে যান এবং ধনী লোকটিকে চ্যাপেল নির্মাণ করার কথা ব্যক্ত করেন। ধনী লোকটি তার কথায় কিছুটা সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করেন কিন্তু তিনি নিজেও অবাক হন এই ভেবে যে, একই স্বপ্ন তিনি নিজেও গত রাতে দেখেছেন। তাই লোকদের সহায়তায় তিনি একটি চ্যাপেল নির্মাণ করেন। এই চ্যাপেলটিতেই পরবর্তীতে ব্যাসিলিকা নির্মাণ করা হয়। যার নাম স্থানীয় ভাষায় আরোকিয়া মাথা বা সুস্বাস্থ্যের জননী

মারীয়া। বর্তমানে এই ব্যাসিলিকার ভিতরেই প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের জন্য প্রার্থনাগৃহ রয়েছে। নিচতলায় দুইটি এবং উপরতলায় একটি প্রার্থনাগৃহ। এই ব্যাসিলিকার তিনটি প্রার্থনাগৃহে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ইংরেজি, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, হিন্দি, কন্নাদী, কান্নাদা প্রভৃতি ভাষায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানে আরেকটি ঘটনা ঘটে। পর্তুগীজ নাবিকেরা চীন থেকে শ্রীলংকায় রওনা হচ্ছিলেন এমন সময় বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়েছিলেন তারা। তখন তারা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মা মারীয়ার নিকট অনুগ্রহ যাচনা করেন। আর এইভাবে তারা সেদিন মা মারীয়ার অনুগ্রহে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাদের জাহাজ অলৌকিকভাবে ভেলেঙ্কিনির তীরে এসে ভিড়েছিল। সেদিন ছিল মা মারীয়ার জন্মদিন অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বর। মা মারীয়ার প্রতি তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাররূপ তারাও তখন নাগাপাট্টিনামের চ্যাপেলটি পুনর্নির্মাণ করেন।

১৬ জুলাই খুব সকালেই ভেলেঙ্কিনিতে পৌঁছেই যাজক ভবনে গেলাম। সেখানে যাজকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা আছে। যাজকদের আইডি কার্ড দেখিয়ে যাজকেরা সেখানে থাকতে পারবেন। আমিও আইডি কার্ড দেখিয়ে যাজক ভবনে প্রবেশ করলাম। আমাকে থাকার জন্য একটা রুম দেখিয়ে দিলেন। তারপর নাস্তা করার জন্য খাবার রুমে গেলাম। খাবার রুমে দেখলাম অতিথি যাজকদের জন্য আলাদা টেবিল সাজানো রয়েছে এবং যারা সেখানকার যাজক তাদের জন্য আলাদা ও পাপস্বীকার শ্রোতা যাজকদের জন্য আলাদা টেবিল সাজানো রয়েছে। আমার সঙ্গে কেরালা থেকে আসা কয়েকজন যাজকও যোগ দিলেন। তারাও তীর্থ করতে এসেছেন। নাস্তার পর খ্রিস্টযাগে যোগদান করলাম। ইংরেজিতে খ্রিস্টযাগ আর মঙ্গলসমাচার পরার জন্য আমাকে বলা হল। আমিও আনন্দিত মনে গ্রহণ করলাম। দেখলাম তারা সুর দিয়ে গান করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। আমিও সুর করে মঙ্গলসমাচার পড়লাম। দক্ষিণ ভারতে দেখেছি সুর দিয়ে গান করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে। তার আগেই ব্যাঙ্গালুরুতে দেখেছি তারাও একইভাবে সুর দিয়ে গান করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে। খ্রিস্টযাগের পর অনেকেই দেখা করতে এলেন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

খ্রিস্টযাগের পর জাদুঘরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার নানা

(বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন...)

সৃষ্টি উদ্যাপনকাল ২০২৬: জীবনময় জলে নবায়িত হই

ফাদার ড. লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

মূলভাব ও সৃষ্টির যত্নে প্রার্থনা দিবস

এ বছর সৃষ্টি উদ্যাপন কাল ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর যা আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্বদিন পর্যন্ত উদ্‌যাপিত হবে। প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর তারিখে ‘সৃষ্টির যত্নে বিশ্ব প্রার্থনা দিবস’ পালন করা হয়। তবে সিবিবি’র সিদ্ধান্ত মতে বাংলাদেশে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম রবিবার অর্থাৎ এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখ (রবিবার) সর্বত্র ‘সৃষ্টির যত্নে প্রার্থনা দিবস’ পালিত হবে। বিশপীয় সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিস্তার কমিশন ২৯ আগস্ট শনিবার সিবিবি সেন্টার ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে দিবসটি উদ্‌যাপন ও সৃষ্টির যত্নে মণ্ডলীতে ‘আমার সবুজ বসতবাটি অঙ্গীকার’ ঘোষণা করা হয়েছে। মূলভাব হিসেবে ‘জীবনময় জলে নবায়িত হই’ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বছর সৃষ্টির যত্নে পরিবারের ভূমিকা অনুধ্যান করবো।

পবিত্র বাইবেলের আলোকে অনুধ্যান

পবিত্র বাইবেল থেকে *এজেকিয়েল ৪৭: ৯, ১২* অংশটি অনুধাবন করা হয়েছে। এটি পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত আশার এক শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা নিরাময় ও পুনর্নবীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। নির্বাসন ও ভগ্নাবস্থার প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরের পবিত্র স্থান থেকে প্রবাহিত জীবনময় জলের চিত্র আমাদের সামনে এক ঐশ্বরিক নিরাময়ের প্রকাশ ঘটায়। যা ভূমি, জল, জীববৈচিত্র্য এবং সৃষ্টির প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ নবায়ন করে। নদী যেদিকে প্রবাহিত হবে সেখানেই অগণিত জীবজন্তু জীবন পাবে, সেখানে প্রচুর মাছ, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ হবে, কারণ এই জল সেখানে পৌঁছে লবণাক্ত জলকে স্বাদুজলে পরিণত করে তুলবে। অতএব নদী যেদিকে প্রবাহিত হবে, সেখানেই সবকিছু জীবন্ত হয়ে উঠবে ... নদীর উভয় তীরে বিচিত্র প্রজাতির ফলদায়ী গাছ ও উদ্ভিদ জন্মাবে। তাদের পাতা কখনো শুকিয়ে যাবে না এবং তাদের ফলও কখনো শেষ হবে না। তারা অবিরত ফল দেবে, তাদের ফল খাদ্য হিসেবে এবং গাছের শিকড়, ছাল, পাতা ও উদ্ভিদ রোগ নিরাময়ের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বাইবেলের এ অংশের প্রেক্ষাপট ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও জাতীয় বিপর্যয়ের সময়। ব্যাবিলনের সৈন্যরা জেরুজালেম ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং সলোমনের মন্দির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইস্রায়েল জাতির বহু মানুষকে তাদের নিজ দেশ থেকে বহুদূরে ব্যাবিলনে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ব্যাবিলনের নদীগুলোর তীরে বসে তারা আত্ননাদ ও বিলাপ করত। সৃষ্টিকাল হলো ঈশ্বর ও সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে নবায়ন করার একটি সময় এবং সুযোগ। আন্তঃমাণুলিক এ উদ্‌যাপনটি খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান জানায়- আমাদের প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার জন্য একসঙ্গে প্রার্থনা এবং কাজের মাধ্যমে যত্নের-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে।



লোগো ও প্রতীকটির অর্থ

প্রতীকে ঈশ্বরের গৃহ থেকে প্রবাহিত জলকে দেখানো হয়েছে-প্রথমে একটি ছোট স্রোত, যা ধীরে ধীরে গভীর ও প্রশস্ত হয়ে বিস্তার লাভ করবে। প্রবহমান স্বাদুজলে নিজীব ও অনুর্বর স্থানে জীবন ফিরে আসে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও ভগ্ন বাস্তুতন্ত্র আবার সজীব ও উর্বর হবে। প্রবাহিত জীবন জলের মাধ্যমে আসে নিরাময় ও সজীবতা। কিন্তু নতুন জীবন লাভ করতে হলে আমাদেরও সেই জলে প্রবেশ করতে হবে ও নিমজ্জিত হতে হবে। ঈশ্বরের জীবনদায়ী নদীর অংশ হয়ে তাঁর প্রদত্ত শক্তিতে সৃষ্টির ভগ্নাবস্থা নিরাময় ও পুনরুদ্ধারের কাজে অংশ নিতে হবে।

জীবনদায়ক সম্পর্কটির নবায়ন

সমন্বিত পরিবেশ বা বাস্তুসংস্থান কেবল প্রকৃতি-পরিবেশ নয়, বরং মানবজীবন, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক জীবন সবকিছুকে সংযুক্ত (লাউদাতো সি)। পরিবেশগত সংকট ও সুরক্ষা যখন জরুরি মনোযোগ দাবি করে, তখন সবচেয়ে গভীরে রয়েছে সম্পর্কের সংকট। মানবজাতি সৃষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার আগে, “ঈশ্বরে সঙ্গে, অপর মানুষের সঙ্গে ও সৃষ্টির সঙ্গে জীবনদায়ক সম্পর্কটি বাইরে যেমন, আমাদের অন্তরের ভিতরও তেমনি ক্ষতিবিক্ষত হয়ে পড়েছে” (লাউদাতো সি, অনু. ৬৬)।

সুতরাং পরিবেশগত প্রশ্নটি মূলত মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, অপর মানুষ, প্রকৃতি-পরিবেশ ও ঈশ্বরের সাথে ঐক্যের সম্পর্ক নিরাময় সম্পর্কিত একটি চেতনা। বিশুদ্ধ পরিবেশ সুরক্ষা জীবনদায়ী সম্পর্কটি পুনর্গঠন ও পুনর্নবীকরণের মাধ্যমেই শুরু হয়।

পরিবারই ধরিত্রীর আদি তত্ত্বাবধায়ক

আদিপুস্তক ঈশ্বরের আদি পরিকল্পনা প্রকাশ করে (১ ও ২ অধ্যায়)। ঈশ্বর অত্যন্ত যত্নের সাথে মানবজাতির জন্য একটি অভিন্ন বসতবাটি এ ধরিত্রী সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির হাতে ধরিত্রী তুলে দেওয়ার আগে ঈশ্বর মানবজাতিকে একটি পরিবারের হাতে সঁপে দিয়েছেন। সুতরাং প্রথম পরিবেশগত যত্নের আহ্বান ও দায়িত্বটি পরিবারকেই দেওয়া হয়েছিল। আমরা সৃষ্টির মালিক না বরং সৃষ্টি হলো ঈশ্বরের দান। এটি মানবজাতিকে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার বা কর্তৃত্ব করার জন্য নয় বরং দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

নাজারেথের পবিত্র পরিবার পথ-প্রদর্শক

নাজারেথে যিশু প্রায় ত্রিশ বছর ধরে পারিবারিক জীবনকে পবিত্র করার জন্য জীবনযাপন করেছেন (লুক ২: ৫১-৫৩)। পবিত্র পরিবার আমাদের শিক্ষা দেয়- পবিত্রতা অর্জিত হয় ভালোবাসা, প্রার্থনা, কাজ ও সেবার মধ্য দিয়ে। যোসেফের ছুতোর কাজ এবং মারীয়ার গৃহস্থালির দৈনিক যত্নে ‘সমন্বিত পরিবেশে পবিত্রতা অনুশীলন’ প্রকাশিত হয়। যেখানে কৃতজ্ঞতা স্বার্থপরতাকে পরাস্ত করে, সহজ-সরল জীবনযাপন অপচয়কে পরাভূত করে এবং সমদায়িত্ববোধ ঈশ্বরের সৃজনশীল কাজে অংশীদারিত্বে পরিণত হয়। প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারকে ‘নাজারেথের একটি ছোট পবিত্র পরিবার’ হয়ে উঠতে আহ্বান করা হচ্ছে। এখানে শিশুদের সৃষ্টিকে সম্মান করতে, দুর্বলদের যত্ন নিতে এবং অপরকে ভাই-বোন হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে (ফাতেল্লি তুত্তি)।

খ্রিস্টীয় পরিবার পরিবেশবিষয়ক বিদ্যালয়

সৃষ্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে আমাদের পরিবারগুলোর যত্নের-সংস্কৃতি প্রতিপালনের ওপর। পরিবেশগত সংকটের সমাধান হলো পরিবার। ‘আমাদের পরিবারের মাধ্যমে আমরা সমগ্র সৃষ্টির অংশ; আমরা পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণে এখানে বিশেষভাবে অবদান রাখি।’ (পোপ ফ্রান্সিসের কাছে সিনড রিপোর্ট, ১৬)। পরিবারেই শিশুরা মূলত সেই সমস্ত

পিতামাতা ও দাদা-দাদীদের আদর্শ ও জীবন অনুসরণ করে পরিবেশগত দায়িত্ব শিখে তারা কৃতজ্ঞতার সাথে জীবনযাপন করে, অল্পই হচ্ছে যথেষ্ট ভাবে শিখে, উদারভাবে সহযোগিতা করে নেয় এবং সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়। তত্ত্বাবধানের শিক্ষাটি প্রথম অর্জিত হয় পরিবারের ভিতরেই। পরিবারের বসতবাড়িতেই শিশুরা খাদ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা, জলের অপরিমিত কার্যকারিতা, গাছ-গাছড়া, উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের প্রতি যত্ন এবং অভাবগতদের প্রতি দরদবোধ প্রকাশ করতে শিখে। পরিবারগুলো এমন প্রথম বিদ্যালয়ে পরিণত হয় যেখানে সমন্বিত পরিবেশবিজ্ঞান কেবল শিক্ষার বিষয় নয়, বরং জীবনযাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ও।

পারিবারিক উদ্যাপনসমূহে পরিবেশগত চেতনা

কানা নগরের বিয়ের ভোজসভায় যিশুর প্রথম অলৌকিক কাজটি একটি পারিবারিক উদ্যাপনের মধ্যেই সংঘটিত হয়, যা নিশ্চিত করে যে পরিবার ও পারিবারিক জীবন ঈশ্বরের পরিদ্রাণ পরিকল্পনায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে (যোহন ২: ১-২)। এই অলৌকিক কাজটি শিক্ষা দেয় যে প্রকৃত প্রাচুর্য কখনো অপচয়মূলক নয়, বরং সর্বদা ঐক্য, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সহযোগিতা ও মর্যাদা রক্ষার দিকে পরিচালিত হয়। সামাজিক আপ্যায়ন (লুক ১০:৩৮-৪২), অবচয়রোধ (মথি ১৪: ১৩-২১), দীনতমদের সাথে সম্পদ ভাগাভাগি করে নেয়ার (লুক ১৯:৮-৯) মাধ্যমে যত্নের-সংস্কৃতি গড়ার শিক্ষাটি যিশুর বাণীপ্রচারের মধ্যেই অনুধাবন করা যায়।

পরিবারসমূহের পরিবার প্রতিটি ধর্মপল্লী

পরিবেশ সুরক্ষার সেবাকাজে ধর্মপল্লীসমূহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিটি ধর্মপল্লীর প্রয়োজন একটি প্রকৃত ‘পরিবারসমূহের পরিবার’ হয়ে ওঠা, যেখানে পবিত্র খ্রিস্টযাগ ঐক্যকে পুষ্টিসাধন করে এবং যেখানে ধর্মশিক্ষা, বিবাহপূর্ব প্রস্তুতি, যুব সেবাকাজ, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ এবং দীনতমদের সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ একসঙ্গে মিলে ‘ধর্মপল্লী পরিবার’ গড়ে উঠে। এমন পরিবার প্রার্থনা, সৃষ্টির যত্ন এবং প্রান্তিক মানুষের সেবাকে একত্রিত করে সৃষ্টির যত্নে বিস্তার অবদান রাখে। মণ্ডলীর প্রাথমিক পরিবেশগত অবদান নিহিত রয়েছে এমন পরিবার গঠনের মধ্যে, যাদের জীবন প্রচার করে যে লোভের চেয়ে কৃতজ্ঞতা বেশি মনোরম এবং আত্মকেন্দ্রিকতার চেয়ে গণমঙ্গল অনেক বেশি মধুর।

যত্নের সংস্কৃতিতে এশীয় পরিবার

এশিয়া মহাদেশে রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, শক্তিশালী পারিবারিক বন্ধন, প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা, অতিথিপরায়ণতা, সরলতা এবং প্রকৃতির সাথে বসবাসের বাস্তব উদাহরণ। যা সুসমাচারের সাথে গভীরভাবে

অনুরণিত হয় এবং সমন্বিত পরিবেশের জন্য উর্বর ভূমি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তবুও এশিয়া মহাদেশে দ্রুত নগরায়ণ, পরিবেশে ভগ্নাবস্থা, জলবায়ু বিপর্যয়, অভিবাসন, দারিদ্র্য, মানবজীবনের মানপতন, সমাজ বিভাজন এবং পারিবারিক জীবনের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের মুখোমুখি। এই ঝুঁকিসমূহ সুসমাচার প্রচারের সুযোগে পরিণত হয়ে উঠেছে। খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃতজ্ঞতা, উদারতা, সরলতা এবং সৃষ্টির যত্ন বাস্তব রূপান্তরের মাধ্যমে আশার জোড়ালো প্রবক্তা হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ঈশ্বরীয় অভিন্ন পরিবারের দিকে আশার যাত্রা

সমন্বিত পরিবেশজ্ঞানকে ঈশ্বরের চিরন্তন পরিকল্পনার আলোকে দেখা যেতে পারে। এই যাত্রা সৃষ্টির প্রথম স্বর্গোদ্যান থেকে শুরু হয়ে পিতার ঈশ্বরীয় অভিন্ন বসতবাড়ির উপস্থিতিতে সমাপ্ত হয়। সমগ্র পরিদ্রাণের ইতিহাস জুড়ে, সৃষ্টি, পরিবার এবং মণ্ডলী-সবাই পিতার প্রেমের বিভিন্ন মাত্রা প্রকাশ করে। খ্রিস্টভক্তরা সৃষ্টির যত্ন নেয় কারণ ঈশ্বর আমাদের জন্য এই সুন্দর ধরিত্রী সৃষ্টি করেছেন, এমন ভাবনায় আমাদের প্রাণ ঈশ্বরের মহিমা গায়। যা মা মারীয়ার প্রশংসাগীতি ও আসিসি সাধু ফ্রান্সিসের সৃষ্টির বন্দনা সংগীতের সাথে সুর মিলিয়ে স্রষ্টার বন্দনা করে। পরিশেষে আমাদের জীবনের অন্তে, আমরা চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার এবং ঈশ্বরকে সামান্যসমনি দেখা করার আশা ও বাসনা নিয়ে বেঁচে থাকি।

ঈশ্বরীয় যাত্রাপথে প্রত্যেকেজনই বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক

খ্রিস্টীয় আশা বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধানকে অনুপ্রাণিত করে। অনন্য বিশ্বাস অন্তরে প্রথিত যে খ্রিস্টের পুনরুত্থান সমস্ত সৃষ্টির নবীকরণ নিশ্চিত করবে। প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারকে একটি ছোট নাজারেথ হতে, প্রতিটি পারিবারিক ভোজকে কৃতজ্ঞতার স্থান হতে, প্রতিটি ধর্মপল্লীকে ‘পরিবারসমূহের পরিবার’ হতে এবং প্রতিটি ধর্মপ্রদেশকে ঈশ্বরের এমন একটি গৃহ হতে আহ্বান জানানো হয়— যে গৃহে দরিদ্রা সুস্বাগত ও সৃষ্টি সুরক্ষিত। এ কষ্টের যাত্রা, এ সংগ্রাম এবং এ ধরিত্রীর ভাবনা-চিন্তা যেন আমাদের প্রত্যাশার আনন্দ বিনষ্ট করতে না পারে (লাউদাতো সি, অনু. ২৪৪)। যিশু বলেন, আমি এখন সব-কিছুই নতুন করে তুলছি (প্রত্যাদেশ ২১:৫)।

সৃষ্টির যত্নে পরিবারের করণীয় কিছু সুপারিশ

ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের ‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীনপত্রটির সাতটি লক্ষ্যের আলোকে এবং ভাটিকানের সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিস্তার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় পরিবার, ধর্মপল্লী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ক্লাব, সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা

প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মসংঘসমূহের সাথে বহুবিধ সুরক্ষা সেবাকাজে অংশগ্রহণ করে ‘আমার সবুজ বসতবাড়ি অঙ্গীকার’ এ সম্পৃক্ত হতে পারি।

১. ধরিত্রীর আর্তনাদ শোনা: বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল, মাটি পরিমিত ব্যবহার করা, বৃক্ষরোপণ, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার এবং প্রকৃতির প্রশংসা করার মতো দৈনন্দিন অভ্যাস গড়ে তোলা।

২. দরিদ্রদের আর্তনাদ শোনা: অতিথি পরায়ণতা, সমদায়িত্ববোধ অনুশীলন, প্রবীণ ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্কদের যত্ন এবং গরীবদের সহায়তা করার মাধ্যমে মানব জীবন ও মর্যাদাকে সুরক্ষা করা।

৩. পরিবেশগত অর্থনীতি অনুশীলন: নৈতিক ও ন্যায্য বাণিজ্য, নিয়মিত ঋণ পরিশোধ, সবুজ সমবায় নীতি বিস্তার এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যয় নীতির মাধ্যমে ‘ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি’ বর্জন করা।

৪. সহজ-সরল জীবনধারা প্রতিপালন: সরল ও পরিশ্রমী জীবনযাপন, নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস চর্চা, সংযম অনুশীলন, অপচয়রোধ, প্রয়োজন ও চাহিদার পার্থক্য বুঝতে শিখা।

৫. পরিবেশগত শিক্ষা বিস্তার: পিতামাতাকে প্রাথমিক নৈতিক ও পরিবেশগত শিক্ষক হিসেবে আদর্শ হওয়া, তারা উদাহরণ ও সংলাপের মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করতে পারে।

৬. পরিবেশগত আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন: ‘সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সঙ্গে, অপর মানুষের সঙ্গে ও সৃষ্টির সঙ্গে’ সম্পর্কটি শক্তিশালী করা, খাবারের পূর্বে ও পরের প্রার্থনাটি করা, আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক প্রার্থনা এবং একত্রে প্রকৃতিতে ভ্রমণকালে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা।

৭. সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়ন: স্থানীয় উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা, গণমঙ্গলনীতির পক্ষ গ্রহণ করা এবং অন্যদের সাথে সম্প্রীতি ও সহহিত রেখে কাজ করা।

পোপ চতুর্দশ লিও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বৃহত্তর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘উদাসীনতা বা হতাশার কোনো স্থান নেই, এখনই কাজে নামতে হবে।’ আমাদের সময়ে সুসমাচার প্রচারের একটি অপরিহার্য ক্ষেত্র হলো প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা রক্ষণাবেক্ষণ করা। আসুন, জীবনময় জলে নবায়িত হই, নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহৎ কাজ দিয়ে ধরিত্রীকে পুনর্নবায়ন করি। হে প্রভু, তোমার নবীকরণে আত্মাকে প্রেরণ কর এবং এ ধরিত্রী ভগ্নাবস্থা থেকে পুনর্নবীকৃত হউক।

(সূত্র: বিশপ স্টিফেন ফার্নান্দেস, বম্বের সহকারী বিশপ, ভারত এর ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রদত্ত উপস্থাপনা।)

পৃথিবী, জীব ও জীবন

বেঞ্জামিন গোমেজ

আমরা কি নিজের কাছে কখনো প্রশ্ন করেছি, আমি কে বা কি? আমার অস্তিত্ব কোথায়? আমার শুরু এবং শেষ কবে বা কোথায়? যদিও ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল তবুও আমাদের প্রত্যেকের একবার হ'লেও নিজেদের কাছে প্রশ্ন করা বিশেষ প্রয়োজন। যখন একটা বাড়ি নির্মাণ করা হয় তখন একাধিক তা অভিজ্ঞ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নির্দেশনাক্রমে একটা নকসা তৈরি হয়ে থাকে। বাড়ি তৈরি হওয়ার সাথে আনুসঙ্গিক বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়োগ্রাণালী, পানি সাথে পানি নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়ায় এবং সব কিছুই বাড়ি তৈরির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। বাড়ির সৌন্দর্যের জন্য ভিতরে ও বাহিরে থাকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট তৈরি বিভিন্ন কারুকার্য। অনেক সময় মনে প্রশ্ন আসে একটা বাড়ির পিছনে যদি এত দক্ষ মানুষের শ্রম থাকে তাহলে একটা মানুষ সৃষ্টিতে কতজনের শ্রম ছিল? কিন্তু না, মানুষ সৃষ্টিতে এ রকম কোন নকশা বা বহু লোকের কোন পরিকল্পনা ছিল না। মানুষ সৃষ্টিতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার একক শ্রম যা শুধু ঐশ্বরিক শক্তির বলে সম্ভব। প্রশ্ন আসে জীবন কি বা জীবনের সংজ্ঞাই বা কি? সাধারণভাবে যা বুঝি, সমস্ত রকম দুঃখ, কষ্টের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর সাথে পাশ্চাত্য লড়ে বেঁচে থাকার নামই জীবন। জীবনের সংজ্ঞা সঠিকভাবে এখনও কেউ দিতে পারেনি। জীবন শুরু কিভাবে তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ এখনও একমতে পৌছাতে পারেননি। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যে সংজ্ঞা এসেছে তা কিছুটা এইরকম; 'জীবন এমন একটি অবস্থা, যা একটি অর্গানিজমকে জড় পদার্থ (প্রাণহীন) ও মৃত অবস্থা থেকে পৃথক করে।' অন্যভাবে 'প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়াকলাপকে জীবন বলা হয়।' (Protoplasm is the living part of a cell that is surrounded by living membrane.)

আবার অনেকের মতে, 'জীবন হলো একটি ক্ষণিক সময় যা আমাদেরকে দেওয়া হয় যাতে আমরা সমস্ত কাজ করতে পারি, লাভ করতে পারি এবং আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করি। জীবন বিশাল একটি অনুভব যা আমাদের কাছে একটি সুযোগ হিসাবে থাকে।'

তবে বর্তমানে, সর্বাধিক স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক মডেলটি মিলার-উরি পরীক্ষণ এবং সিডনি ফক্সের কাজের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা, যেখানে বলা হয়েছে যে, আদি-পৃথিবী রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায় অনুকূলে

ছিল, যা অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acid) এবং পূর্বের অজৈব যৌগ থেকে সৃষ্টি বিভিন্ন জৈব যৌগের সমন্বয় করে এবং ফসফোলিপিড (Phospholipids) গুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিপিড বাইলিয়ার (Lipid Bilayer) গঠন করে,- একটি কোষীয় ঝিল্লির (Plasma Membrane) মৌলিক কাঠামো গঠন করে। (Structure and function of cell)।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিক ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ৩.৫ গিগা বছরের আগে প্রতিক্রিয়াশীল ফসফরাস প্রজাতি (যেমন ফসফাইট) এর প্রাচুর্য ছিল পৃথিবীর সাগরগুলোতে, এবং ফলশ্রুতিতে এসক্রাইবারসাইট (Ascribersite) সহজেই জলীয় গ্লিসারলের সাথে বিক্রিয়া করে ফসফাইট এবং গ্লিসারল ৩-ফসফেট উৎপন্ন করতে পারতো। এটা অনুমান করা হয় যে, সর্বশেষ ভারী গ্রহণবর্ষণ থেকে আগত উল্কাপিণ্ড এর অংশ হল এসক্রাইবারসাইট- থেকে প্রথম ফসফরাস পৃথিবীতে এসে থাকতে পারে, যা প্রাইবায়োটিক জৈব অণুগুলির সাথে বিক্রিয়া করে ফোফরাইলেটেড বায়োমোলিকুলস যেমন আরএনএ গঠন করতে পারে। অপর পক্ষে মৃত্যু হলো সকল জৈবিক প্রক্রিয়ার চিরস্থায়ী সমাপ্তি।

জীব হিসাবে মানুষকে যে বৈজ্ঞানিক তৈরী করেছেন বা মডেল দিয়েছেন সে কে? একটা মানুষের ভিতর বা বাহিরে থাকে অনেক অনেক কিছুর সমন্বয়। ভিতরের কথায় একটু পরে আসছে। বাহিরটা দেখুন, যে আর্কিটেকচার এর ডিজাইন করেছে তার চিন্তাভাবনা কি রকম ছিল? ধরি মাথার অংশ -- মুখ দিয়ে খাবার, চোখ দিয়ে দেখা, নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস, মাথার চুল সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে মাথাকে রক্ষা করে অনেক কিছুর হাত থেকে। তারপর সুডোল একটা গঠন। শরীরের সমস্ত ভার বহন করার জন্য পা। হাত কাজের জন্য। তারপর ভিতরের যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সাজানো, যেখানে নেই কোন কার্পণ্য। প্রত্যেকটা অঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একে অপরের পরিপূরক। সৃষ্টিতে আমাদের মাঝে দুটো মত আছে, এক প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক আর অন্যটি ঐশ্বরিক।

বৈজ্ঞানিক মতামতের ভিত্তিতে পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অন্তত ৩.৫ বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে জীবন বিদ্যমান যার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন

জীবে জীবাশ্ম চিহ্নের বয়স প্রায় ৩.৭ বিলিয়ন বছর। কিছু অন্যান্য তত্ত্বমতে, যেমন- সর্বশেষ গ্রহণপঞ্জের ভারীবর্ষণ তত্ত্ব অনুসারে, পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটে আরো আগে থেকে, যার প্রারম্ভ হয় প্রায় ৪.১-৪.৪ বিলিয়ন বছর আগে। ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবীর গঠনের কিছু সময় পর, ৪.৪১ বিলিয়ন বছর পূর্বে মহাসাগরসমূহের গঠনের পর প্রায় ৪.২৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম জীবনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। যে প্রক্রিয়ায় জীবনের উৎপত্তি হয়েছে তা আজও অজানা রয়ে গেছে, যদিও অনেক অনুসন্ধান গঠন করা হয়েছে এবং সেগুলো বেশিরভাগ সময়ই মিলার-উরি নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করে।

প্রাপ্ত প্রথম জীবনের অস্তিত্ব হল ব্যাকটেরিয়ার মাইক্রোফসিল, ৩.৪৫ বিলিয়ন বছর পুরাতন অস্ট্রেলিয়ান শিলায় অণুজীব পাওয়া গেছে বলে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে বিজ্ঞানীরা ৩৫৫টি জিনের সেট প্রাপ্তির প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যাদের সকল জীবের সর্বশেষ সার্বজনীন একই পূর্বপুরুষ বলে উপস্থাপন করা হয়। ৬ মিলিয়ন বছর ধরে বিকশিত হয়েছে মানুষের শারীরিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি যা এপেলাইক পূর্বপুরুষদের থেকে উদ্ভূত এবং এটাই ছিল বৈজ্ঞানিকগণের জীবন সম্পর্কে প্রমান সহ সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

এখানে এটাও সার্বিক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক বিশাল অলৌকিক শক্তি, যে শক্তি তুলনাহীন। সেই শক্তিই স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, প্রভু বা ভগবান। আদিতে ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতে থাকবেন। আদি এবং অনন্তকাল, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের মহানায়ক। পূর্বের অনেক ঘটনা বা দুর্যোগের দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানি এবং এখনো অনেক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে আমাদের সংগ্রাম করে চলতে হয়। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে সুনামিতে ইন্দোনেশিয়া প্রায় ১,৬৭০০০ মানুষ নিহত হয়। তারপর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে সুনামিতে প্রায় ১৮,০০০ এর বেশি লোক মারা যায়। সুনামি (Tsunami) এমনই একটা বিশাল আকারের জলোচ্ছ্বাস বা ঢেউ যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এখনও বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করতে পারেননি। এরপর দেখি ঝড়-বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, মহামারী এবং নানান রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ঈশ্বরিক শক্তিতে বলিয়ান মানুষ আজ নিজেই ঈশ্বর হয়ে উঠার নেশায় মত্ত! চিরজাগ্রত পৃথিবীকে নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে, স্বর্গীয় ক্ষমতাগুলোকে আয়ত্তে আনার প্রবল বাসনা। এটা কি সম্ভব?

তথ্যসূত্র: গুগল

জলবায়ু পরিবর্তনের অদৃশ্য সংকট ও পরিণতি

নিকোলাস বিশ্বাস

জলবায়ু পরিবর্তনের কথা উঠলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছু পরিচিত দৃশ্য-ভয়াবহ দাবানল, আকস্মিক বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ কিংবা খরায় ফেটে যাওয়া মাটি। সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং টেলিভিশনের পর্দায় এসব দৃশ্যই সবচেয়ে বেশি স্থান পায়। কারণ এগুলো তাৎক্ষণিক, দৃশ্যমান এবং উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এগুলো জলবায়ু সংকটের কেবল দৃশ্যমান অংশ। যেমনি হিমশৈলের (Iceberg) সবচেয়ে বড় এবং গভীর অংশ লুকিয়ে থাকে পানির নিচে তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনের গভীর প্রভাব ও ক্ষত মিশে থাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝে যা উপর থেকে দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত ক্ষতি শুধু ঘরবাড়ি ধ্বংস বা ফসলহানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই উন্নয়নের ওপর দীর্ঘমেয়াদি ও বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলে। এই সংকটকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের দৃশ্যমান দুর্যোগের বাইরে গিয়ে এর অন্তর্নিহিত কারণ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবগুলো বুঝতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

দৃশ্যমান দুর্যোগ; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকাশ্য রূপ: বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা ক্রমাগত বাড়ছে। অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী খরা, তীব্র তাপপ্রবাহ, শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এবং দাবানল পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপর্যস্ত করছে। এসব দুর্যোগ তাৎক্ষণিক প্রাণহানি, অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই গণমাধ্যমের প্রধান শিরোনাম হয়। দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে সরকার ও মানবিক সংস্থাগুলো ত্রাণ ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ থাকে তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেই, অথচ এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলো অনেক বেশি গভীর এবং জটিল যা আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।

দুর্যোগের আড়ালে গুরু হয় আরেকটি সংকট: প্রতিটি জলবায়ুজনিত দুর্যোগ একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে। যখন

খরায় ফসল নষ্ট হয়, তখন শুধু কৃষকের উৎপাদনই কমে না; খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়, বাজারে খাদ্যের দাম বেড়ে যায় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরও বেশি খাদ্য অনিরাপত্তার মুখোমুখি হয়। কৃষক তার আয়ের উৎস হারান, পরিবারগুলো ঋণের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয় এবং অনেক মানুষ মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

একইভাবে নদী, খাল ও জলাধার শুকিয়ে গেলে শুধু পানির সংকটই সৃষ্টি হয় না; কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নিরাপদ পানির জন্য দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়, যা তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগকেও সীমিত করে।

খাদ্য নিরাপত্তার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুতর কিন্তু কম আলোচিত প্রভাবগুলোর একটি হলো খাদ্য নিরাপত্তা। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, মাটির উর্বরতা হ্রাস, বন্যা ও খরার কারণে কৃষি উৎপাদন দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুদ্র কৃষকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

ফসলের উৎপাদন কমে গেলে খাদ্যের দাম বেড়ে যায়। দরিদ্র পরিবারগুলো বাধ্য হয়ে কম এবং নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণ করে। এর ফলে অপুষ্টি বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের মধ্যে। ক্ষুধা তখন শুধু একটি মানবিক সংকট নয়; এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জলবায়ু-সহনশীল কৃষি ব্যবস্থা ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

জনস্বাস্থ্যের জন্য এক নীরব হুমকি: জলবায়ু পরিবর্তন এখন জনস্বাস্থ্যের জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের কারণে হিট স্ট্রোক, পানিশূন্যতা এবং তাপজনিত অসুস্থতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যার কারণে নিরাপদ পানির উৎস দূষিত হয়ে কলেরা, ডায়েরিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। অন্যদিকে তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে মশাবাহিত রোগ যেমন ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার বিস্তার নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অনেক হাসপাতাল

ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে জরুরি চিকিৎসা প্রদান ব্যাহত হয়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে স্বাস্থ্যখাতকে আরও শক্তিশালী ও সহনশীল করে গড়ে তোলা জরুরি।

অর্থনৈতিক ক্ষতি ও বৈষম্যের বিস্তার: জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশ নয়, অর্থনীতিকেও গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রতিটি দুর্যোগের পর সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয় উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্গঠনে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন। তারা সম্বল হারায়, ঋণগ্রস্ত হয়, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবনামূলক বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্রের চক্র আটকে পড়ে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যেসব জনগোষ্ঠীর দায় সবচেয়ে কম, তারাই এর সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী।

বাস্তুচ্যুতি, অভিবাসন ও সামাজিক অস্থিরতা: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ তাদের বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, উপকূলীয় লবণাক্ততা, বন্যা ও দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে বহু এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। ফলে জলবায়ুজনিত অভিবাসন দিন দিন বাড়ছে। অন্যদিকে সীমিত ভূমি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হওয়ায় অনেক অঞ্চলে সামাজিক উত্তেজনা, সংঘাত এবং নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন কেবল পরিবেশগত নয়, সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যও বড় হুমকি হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগের কারণে প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ নতুন অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে। ভবিষ্যতে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ এবং বৈশ্বিক অভিযোজনমূলক পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু বা পরিবেশগত অভিবাসীর সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লাখ থেকে ১০০ কোটিরও বেশি হতে পারে।

(বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন...)

দর্শন দানের মাধ্যমে ক্যাটালিনা রিভাস এর কাছে পবিত্র খ্রিস্টযাগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

সিস্টার রুমা গমেজ

প্রভুর প্রার্থনা ও শান্তি শুভেচ্ছা

আমরা যখন প্রভুর প্রার্থনা “হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা” প্রার্থনা করতে যাচ্ছিলাম, তখন প্রভু এই উদ্‌যাপনের মধ্যে প্রথমবারের মতো কথা বললেন এবং বললেন: “অপেক্ষা করো, আমি চাই তোমরা তোমাদের অন্তরের গভীরতম অনুভূতি দিয়ে প্রার্থনা করো। এই মুহূর্তে মনের মধ্যে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গের কথা নিয়ে এসো যারা তোমার জীবনে তোমার সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে, যাতে তুমি তাদের বুকে জড়িয়ে ধরতে পারো এবং অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে বলতে পারো: ‘যিশুর নামে, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম এবং তোমার শান্তি কামনা করি। যিশুর নামে, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি এবং আমার শান্তি তোমাকে দিচ্ছি।’ সেই ব্যক্তি যদি এই শান্তির যোগ্য হয়, তবে সে তা লাভ করবে এবং তার ভালো লাগবে। আর যদি সে নিজেকে এই শান্তির জন্য উন্মুক্ত করতে না পারে, তবে সেই শান্তি তোমার নিজের হৃদয়েই ফিরে আসবে। কিন্তু প্রথমে তুমি নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করতে এবং অন্তরে শান্তি অনুভব করতে না পারছ, ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি গ্রহণ বা প্রদান করো না।” প্রথমে নিজে আগে অন্যকে ক্ষমা করো ও শান্তি লাভ করো, তারপর অন্যকে তা প্রদান ও গ্রহণ করো, শুধু মুখে নয় হৃদয় দিয়ে ক্ষমা করতে হবে।

“তোমরা কী করছ সে বিষয়ে সতর্ক থাকো,” প্রভু বলতে লাগলেন, “তোমরা ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’ প্রার্থনায় বারবার বলো: ‘আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি।’ তোমরা যদি মানুষের অপরাধ ক্ষমা করো কিন্তু তা ভুলে না যাও (যেমনটা অনেকে বলে থাকে), তবে তোমরা ঈশ্বরের ক্ষমার ওপর শর্ত আরোপ করছ। তোমরা পক্ষান্তরে বলছ: ‘আমি যেভাবে মানুষকে ক্ষমা করতে পারি, আপনিও আমাকে ঠিক সেভাবেই ক্ষমা করুন, তার বেশি নয়।’”

আমরা প্রভুকে কতটা কষ্ট দিতে পারি এবং নিজেদের কুসংস্কার, অতি-সংবেদনশীলতা ও ক্ষেত্রের কারণে নিজেদের কতটা ক্ষতি করতে পারি তা উপলব্ধি করে আমি যে কী পরিমাণ মানসিক বেদনা অনুভব করলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমি ক্ষমা করলাম; অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি নিজে যাদের

কখনো না কখনো আঘাত করেছি, তাদের সবার কাছে ক্ষমা চাইলাম যেন আমি প্রভুর সেই স্বর্গীয় শান্তি নিজের অন্তরে অনুভব করতে পারি।

যাজক বললেন, “... প্রভু আপনাদের শান্তি প্রদান করুন...” এবং তারপর, “প্রভুর শান্তি সর্বদা তোমাদের মধ্যে বিরাজ করুন। আসুন আমরা পরস্পরকে শান্তি প্রদান করি”।

হঠাৎ আমি দেখলাম, যারা একে অপরকে কোলাকুলি বা আলিঙ্গন করছিল, তাদের অনেকের (সবার নয়) মাঝখানে এক পরম উজ্জ্বল আলো এসে বিরাজ করছে। আমি বুঝতে পারলাম এটি স্বয়ং যিশু, এবং আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার পাশের মানুষটিকে জড়িয়ে ধরলাম। সেই আলোর মধ্যে আমি সত্যিই প্রভুর আলিঙ্গন অনুভব করতে পারছিলাম। তিনিই আমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর শান্তি দিচ্ছিলেন, কারণ সেই মুহূর্তে আমি অন্য সবার প্রতি থাকা সমস্ত ক্ষোভ মন থেকে দূর করে ক্ষমা করতে পেরেছিলাম। যিশু ঠিক এটাই চান আমাদের জড়িয়ে ধরে ও তাঁর শান্তি দিয়ে আনন্দের এই মুহূর্তটি ভাগ করে নিতে।

যাজকদের পবিত্র কম্যুনিয়ন (খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ)-এর সময় এলো। সেখানে আমি আবারও আর্চবিশপের পাশে সমস্ত যাজকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম। তিনি যখন খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করলেন, ধন্যা কুমারী বললেন: “এটিই হলো পৌরহিত্যকারী যাজক এবং তাঁর সাথে থাকা অন্য যাজকদের জন্য প্রার্থনা করার উপযুক্ত সময়। আমার সাথে সমন্বয়ের বলো: ‘প্রভু, তাঁদের আশীর্বাদ করুন, তাঁদের পবিত্র করুন, তাঁদের সাহায্য করুন, তাদের শূচি-শুদ্ধ রাখুন, তাঁদের ভালোবাসুন, তাঁদের যত্ন নিন এবং আপনার প্রেম দিয়ে তাঁদের আগলে রাখুন। পৃথিবীর সমস্ত যাজকদের কথা স্মরণ করো, সমস্ত উৎসর্গীকৃত আত্মার জন্য প্রার্থনা করো...”

প্রিয় ভাই-বোনেরা, এটিই যাজকদের জন্য প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত, কারণ আমরা সাধারণ বিশ্বাসীরা যেমন মণ্ডলীর অংশ, তাঁরাও তেমনি। অনেক সময় আমরা যাজকদের কাছে অনেক কিছু দাবি করি, কিন্তু তাঁদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি না; আমরা ভুলে যাই যে তাঁরাও মানুষ এবং তাঁদের চারপাশের একাকীত্ব ও মানসিক অবস্থাকে আমরা বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হই।

আমাদের বোঝা উচিত যে যাজকরা আমাদের মতোই মানুষ এবং তাঁদেরও সহানুভূতি ও যত্নের প্রয়োজন আছে। আমাদের কাছ থেকে তাঁদের স্নেহ ও মনোযোগ প্রয়োজন, কারণ তাঁরা যিশুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়ে আমাদের প্রত্যেকের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন। (শুধুমাত্র আপনার বাছাইকৃত কোন নির্দিষ্ট যাজক নয় কিন্তু সকল যাজকদের জন্যই তা প্রযোজ্য)

প্রভু চান যে পালক বা যাজকের ওপর ঈশ্বর যে বিশ্বাসী মণ্ডলীর দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা যেন তাঁর পবিত্রকরণের জন্য প্রার্থনা ও সাহায্য করে। একদিন যখন আমরা মৃত্যুর ওপারে যাব, তখন আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের আত্মার পরিদ্রাণের জন্য ঈশ্বর আমাদের যাজকদের দিয়ে কত বড় চমৎকার কাজ সাধন করেছেন।

খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ পর্ব

মানুষজন খ্রিস্টপ্রসাদ বা কম্যুনিয়ন গ্রহণের জন্য লাইনে দাঁড়াতে শুরু করল। পরম মিলনের সেই মহামহিম মুহূর্তটি উপস্থিত হলো। প্রভু আমাকে বললেন: “একটু অপেক্ষা করো; আমি চাই তুমি কিছু একটা লক্ষ্য করো...” আমার ভেতরের একটি তাড়না আমাকে চোখ তুলে সেই মানুষটির দিকে তাকাতে বাধ্য করল, যে যাজকের হাত থেকে জিহ্বায় খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে যাচ্ছিল। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, এই মহিলাটি আমাদের প্রার্থনা দলেরই একজন ছিলেন। যিনি আগের রাতে পাপস্বীকার করতে পারেননি, কিন্তু আজ সকালে খ্রিস্টযাগ শুরু হওয়ার আগে তা করতে পেরেছিলেন। যাজক যখন তাঁর জিহ্বায় পবিত্র কম্যুনিয়ন রাখলেন, তখন এক সোনালী-শুভ্র আলোর বলকানি সেই মহিলাটির পিছন দিক থেকে তাঁর পুরো শরীর, কাঁধ এবং মাথাকে আবৃত করে ফেলল। প্রভু বললেন: “একটি পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে যখন কোনো আত্মা আমাকে গ্রহণ করতে আসে, তখন আমি নিজেই তাকে এভাবে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করি।” যিশুর কণ্ঠস্বরটি ছিল একজন অত্যন্ত সুখী মানুষের মতো।

আমার সেই বাস্তবীকে আলোয় ঘেরা অবস্থায় যিশুর আলিঙ্গনে নিজের আসনে ফিরে আসতে দেখে আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমি ভাললাম, আমরা কত বড় সৌভাগ্য হাত ছাড়া করি যখন আমরা ছোট-বড় অপরাধ ও

পাপের বোঝা নিয়ে যিশুকে গ্রহণ করতে যাই অথচ এই মুহূর্তটি হওয়ার কথা ছিল এক পরম উৎসবের! অনেক সময় আমরা অজুহাত দিই যে, যেকোনো মুহূর্তে পাপস্বীকার করার মতো কোনো যাজক পাওয়া যায় না। কিন্তু সমস্যাটি প্রতি মুহূর্তে পাপস্বীকার করার নয়, বরং সমস্যাটি হলো আমাদের সহজে পুনরায় পাপে পতিত হওয়ার প্রবণতা। অন্যদিকে, আমরা যেভাবে কোনো পাপটিতে যাওয়ার জন্য বিউটি পার্লার বা সেলুন খোঁজার আশ্রয় চেষ্টা করি, তেমনি আমাদের আত্মা থেকে সমস্ত ময়লা দূর করার জন্য যাজক খোঁজার ক্ষেত্রেও আমাদের সমান চেষ্টা করা উচিত। আমাদের হৃদয় কুৎসিত জিনিসে পূর্ণ রেখে যেকোনো মুহূর্তে যিশুকে গ্রহণ করার ধৃষ্টতা দেখানো উচিত নয়।

আমি যখন নিজে কম্যুনিয়ন গ্রহণ করতে গেলাম, যিশু আমাকে বললেন: “শেষ নৈশভোজ ছিল আমার আপনজনদের সাথে গভীরতম অন্তরঙ্গতার মুহূর্ত। প্রেমের সেই পরম লগ্নে, মানুষের চোখে যা এক চরম পাগলামি বলে মনে হতে পারে আমি নিজেকে সেই প্রেমের বন্দী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমি খ্রিস্টপ্রসাদ প্রবর্তন করেছি। আমি যুগের শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে থাকতে চেয়েছিলাম কারণ আমার প্রেম তোমাদের অনাথ হিসেবে রেখে যাওয়া সহ্য করতে পারছিল না, যাদের আমি আমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছি।”

আমি যখন কম্যুনিয়ন গ্রহণ করলাম, তার স্বাদ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এটি ছিল রক্ত এবং ধূপের এক মিশ্রণ যা আমার সমগ্র সত্ত্বাকে প্লাবিত করে দিল। আমি এত গভীর ভালোবাসা অনুভব করলাম যে নিজের অজান্তেই আমার চোখ দিয়ে কান্না ঝরতে লাগল। আমি যখন আমার আসনে ফিরে এসে হাঁটু দিলাম, প্রভু বললেন: “শোনো...” এক মুহূর্ত পরে, আমি আমার সামনে বসা একজন মহিলার মনের প্রার্থনা শুনতে পেলাম, যিনি এইমাত্র কম্যুনিয়ন গ্রহণ করেছেন।

সে মুখ না খুলেই মনে মনে যা বলছিল, তা ছিল কম-বেশি এইরকম: “প্রভু, মনে রাখবেন মাসের শেষ চলে এসেছে এবং আমার কাছে ঘরের ভাড়া, গাড়ির কিস্তি কিংবা সন্তানদের স্কুলের ফিস দেওয়ার মতো টাকা নেই। আপনাকে সাহায্য করার জন্য কিছু একটা করতেই হবে... দয়া করে আমার স্বামীর অতিরিক্ত মদ্যপান বন্ধ করুন। সে প্রায়ই মাতাল থাকে যা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আর আমার ছোট ছেলেটা এবারও ফেল করবে যদি না আপনি তাকে সাহায্য করেন। এই সপ্তাহে তার পরীক্ষা আছে... আর আমাদের প্রতিবেশীর কথা ভুলবেন না,

যাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। তাকে জলদি এখান থেকে বিদায় করুন। আমি তাকে আর সহ্য করতে পারছি না, ইত্যাদি ইত্যাদি।”

এরপর আর্চবিশপ বললেন: “আসুন আমরা প্রার্থনা করি,” এবং স্বাভাবিকভাবেই সমবেত জনতা শেষ প্রার্থনার জন্য উঠে দাঁড়ালো। যিশু অত্যন্ত বিষন্ন কণ্ঠে বললেন: “তুমি কি তার প্রার্থনাটি লক্ষ্য করেছ? একটি বারের জন্যও সে আমাকে বলেনি যে, সে আমাকে ভালোবাসে। একটি বারের জন্যও সে আমাকে ধন্যবাদ জানায়নি সেই উপহারের জন্য, যা দিয়ে আমি আমার ঈশ্বরত্বকে তার দীন মানবতাবোধের কাছে নামিয়ে এনেছি; যাতে তাকে আমার স্তরে উন্নীত করতে পারি। একটি বারের জন্যও সে বলেনি: ‘ধন্যবাদ, প্রভু’। এটি ছিল কেবল একগুচ্ছ দাবির তালিকা, আর যারা আমাকে গ্রহণ করতে আসে তাদের প্রায় সবার প্রার্থনাই এমন।” “আমি ভালোবাসার জন্য মরেছি এবং পুনরুত্থিত হয়েছি। ভালোবাসার টানেই আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য অপেক্ষা করি এবং ভালোবাসার জন্যই তোমাদের সাথে অবস্থান করি... কিন্তু তোমরা বুঝতে পারো না যে আমারও তোমাদের ভালোবাসার প্রয়োজন আছে। মনে রেখো, আত্মার এই পরম পবিত্র লগ্নে আমি হলাম ভালোবাসার এক ভিখারি।”

আপনারা কি বুঝতে পারছেন? তিনি স্বয়ং প্রেম হয়েও আমাদের ভালোবাসার জন্য ভিক্ষা করছেন, আর আমরা তাঁকে তা দিচ্ছি না! উপরন্তু, আমরা প্রেমের পরম আধার প্রভুর সাথে সেই মিলন এড়িয়ে চলি, যিনি নিজেকে চিরস্থায়ী উৎসর্গ হিসেবে আমাদের বিলিয়ে দিয়েছেন। (চলবে)

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে কোটি কোটি মানুষ অভ্যন্তরীণ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হতে পারে। এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই প্রায় ২ কোটি মানুষ অভ্যন্তরীণ জলবায়ু অভিবাসীতে পরিণত হতে পারে। Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)-এর তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে (২০১৪-২০২৩) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ২১ কোটি ৮০ লাখ মানুষের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটিয়েছে যা বিভিন্ন দেশে অমানবিক বিপর্যয় ডেকে আনছে।

জলবায়ু সংকট: উন্নয়নেরও বড় চ্যালেঞ্জ: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পর্শ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে

বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিক্ষা ব্যাহত হয়। স্বাস্থ্যসেবা দুর্বল হয়ে পড়ে। কৃষি, শিল্প ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের একটি বড় অংশ পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে ব্যয় করতে হয়। ফলে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন অনেক দেশের জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। এজন্য পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই জরুরী।

দুর্যোগের আগে বিনিয়োগই সর্বোত্তম সমাধান: জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা শুধু দুর্যোগের পর ত্রাণ বিতরণে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রয়োজন জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি, নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা, বন ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ এবং কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা। একই সঙ্গে এমন নীতি প্রণয়ন করতে হবে, যা দুর্যোগ ঘটান আগেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেবে এবং তাদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

দৃশ্যমান ক্ষতির বাইরে তাকানোর সময় এখনই: জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি অনেক সময় চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটিই মানুষের জীবন, জীবিকা, অর্থনীতি এবং ভবিষ্যৎকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই শুধু বন্যা, খরা কিংবা দাবানলের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করলেই চলবে না। আমাদের দেখতে হবে খাদ্য সংকট, স্বাস্থ্যঝুঁকি, দারিদ্র্য, বৈষম্য, বাস্তুচ্যুতি এবং উন্নয়নের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব। এই সামগ্রিক চিত্রটি উপলব্ধি করলেই আমরা এমন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারব, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সহনশীল, নিরাপদ এবং টেকসই পৃথিবী গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

উপসংহার: সংকটের আড়ালে গভীর সংকট: জলবায়ু পরিবর্তন কেবল একটি পরিবেশগত সংকট নয়; এটি মানবসভ্যতার অস্তিত্ব, অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য এক বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। অতএব, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় আমাদের শুধু দৃশ্যমান দুর্যোগ নয়, বরং এর অন্তর্নিহিত ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলোর প্রতিও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রকৃত সমাধান তখনই সম্ভব, যখন আমরা কেবল লক্ষণ নয়, সংকটের মূল কারণ এবং এর বহুমাত্রিক প্রভাব মোকাবিলায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করব। তাহলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সহনশীল এবং টেকসই পৃথিবী নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

যমালয় থেকে মর্তে

মিল্টন রোজারিও

“যমালয় থেকে মর্তে” কথাটি শুনতেই বেথাপ্লা লাগছে। কি অদ্ভুত কথা! এটা কি করে সম্ভব! স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, যমালয় থেকে মর্তে কি ভাবে সম্ভব? তবে, ঘটনাটি যদি এমন হয় তবে কেমন হবে?

বেশ ক’বছর আগে লট ভানু বন্দোপাধ্যায়ের অভিনীত “যমালয়ে জীবন্ত মানুষ” নামের একটি সিনেমা দেখেছিলাম ইউটিউবে। “যমালয়ে জীবন্ত মানুষ” বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র রচিত একটি হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক গল্প (বা ছোট উপন্যাস) এটি।

যাহোক, অনেকেই সিনেমাটি দেখেছেন নিশ্চয়ই। তবুও একটু বলছি। মানুষ মারা গেলে তবেই সে সেই যমালয়ে যেতে পারে, অন্যথায় সেটা সম্ভব নয়। যমালয়ে মানুষের বিচার হয়। বিচারে জগতে যে ভালো এবং পুণ্যের কাজ করেছেন, তিনি স্বর্গে যাবেন। আর যিনি জগতে ভালো কাজ করেন নাই, মন্দ কাজ করেছেন এবং পুণ্যও কামাই করতে পারেন নাই, তিনি যাবেন নরকে। স্বর্গ আর নরকে যাবার মাঝখানে একটু সুযোগ আছে, স্বর্গে যাবার। আর সেটি হলো যারা পুণ্যের কাজ করেন নাই অথচ ভালো কাজ করেছেন, তাকে আবার যমালয় থেকে মর্তে অর্থাৎ পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠানো হয় সেই পুণ্যের কাজ করার জন্য।

এই সিনেমাটি দেখার পর ভাবলাম কলকাতা গিয়ে লট ভানু বন্দোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে হবে। জানতে হবে তিনি যমালয়ে গিয়ে কি কি দেখেছেন? যেই ভাবা সেই কাজ। গিল্লিকে বললাম, আমি কলকাতা যাচ্ছি। তুমি যাবে নাকি? গেলে তৈরি হয়ে নাও। গিল্লির প্রশ্ন, যে গরম আবার বৃষ্টি, কলকাতায় এই সময় প্রচুর বৃষ্টি হয়। বর্ষার পরে গেলে হয় না? আমি বললাম, না। এখনই যাবো। কলকাতায় গিয়ে আমি লট ভানু বন্দোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে চাই। তার সাথে দেখা করা আমার ভীষণ জরুরী। অগত্যা গিল্লি রাজি হলো। ইন্ডিয়া যাবার ভিসার জন্য আবেদন করলাম। ফটাফট ভিসা পেয়ে গেলাম। তাও আবার একসাথে পাঁচ বছরের ভিসা পেয়ে গেলাম আমরা দু’জনই। পরের সপ্তাহে চলে গেলাম কলকাতা।

উত্তর কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির বিপরীতে অবস্থিত কফি হাউস বা রেষ্টোরা। কফি হাউসটি বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের জন্য একটি নিয়মিত আড্ডার স্থান। এটি একটি বিখ্যাত মিটিং প্লেসও। এই রেষ্টোরাটি বাঙালি সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

যাহোক, আমি পর পর দু’দিন কফি হাউসে গিয়ে লট ভানু বন্দোপাধ্যায়ের দেখা পেলাম না। রেষ্টোরার ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি লট ভানু বন্দোপাধ্যায়ের সাথে একটু দেখা করবো বলে। উনি বললেন, একটু বসুন কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদা এসে যাবেন। বলতে না বলতেই দেখি ধুতি শাট পরে বাম হাতে শালপাতার বিড়ি টানতে টানতে ভানু বন্দোপাধ্যায় রেষ্টোরার একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসলেন। সেখানে বিরাট একটি গোল টেবিল। তার চারপাশে নাটক পাড়ার সব লোকজন বসে। ভানুবাবু সেখানে উপস্থিত হতেই সবাই দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন। আমি ম্যানেজার বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। একটু পরে বৃকে সাহস নিয়ে ভানুবাবুর কাছে এসে নমস্কার জানিয়ে বললাম, প্রণাম নেবেন দাদা। একটু পায়ের ধুলো নেবো বলে যেই পায়ের হাত দিতে যাবো, ভানুবাবু সাথে সাথে বলে উঠলেন, আরে-- করে কি, করে কি! পায়ের না। পায়ের না। আপনি আমার বৃকে আসুন। বৃকে জড়ানোর পর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কে আপনি? আপনাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারলাম না? আমি বললাম, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি দাদা। ভানুবাবু তার স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে বললেন, ও হো আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? তা কি ব্যাপার এই অধর্মের কাছে? আমি বললাম, দাদা একটি বিষয় আমি আপনার কাছ থেকে জানতে এসেছি, আশা করি আপনি আমাকে সত্য সত্য সব বলবেন। নিরাশ করবেন না। বাংলাদেশে গিয়ে আমি সবাইকে আপনার এই মেসেজটি জানাতে চাই। আমার কথা শুনে ভানুবাবু একটু চুপ করে রইলেন। পরে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঐ হইরা তোরা একটু বয়। আমি এই দাদার লগে একটু কথা বইলা আইতাছি। আমাকে বললেন, আপনি আমার সাথে আসুন। আমি সুবোধ বালকের মত ভানুবাবুর পিছনে পিছনে একটি কক্ষ গেলাম। কক্ষটি ছোট। পূর্ব দক্ষিণে দু’টি জানালা। একটি টেবিল চারটি চেয়ার পাতা রয়েছে সেখানে। আমাকে বসতে বলে উনি বসলেন। তারপর বললেন, কি খাবেন? ঠান্ডা না গরম? আমি বললাম, কফি হাউসে এসে ঠান্ডা খাবো না। কফিই খাই। দাদা দুই কাপ কফির অর্ডার দিলেন। তারপর বললেন, বলুন কি ব্যাপার? আমি বললাম, আপনাকে দেখেছি সেই যমালয়ে জীবন্ত মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে কি কি দেখেছেন (?) আমি সেই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাইছি। ভানুবাবু এবার খুব সুন্দর করে হেসে

বললেন, আরে, ঐটা তো একটা সিনেমা। আর আমি তো সেখানে নিজের ইচ্ছায় যাই নাই। ভাদ্র মাসের এই গরমে আমি ছাদের উপরে ঘুমাইয়া আছিলাম। যমদূতেরা ভাবছিল আমি বুঝি মৃত। তাই তারা আমাকে তুলিয়া নিয়া গেছিলো। সেখানে গেলে যমদূতদের প্রধান আমাকে দেইখা কইলো, এ কাকে ধরে নিয়ে এসেছো তোমরা? এই লোক তো জীবিত? একে এফুগি মর্তে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। তখন আমি এক লাফ দিয়া উইঠা তাঁকে বললাম। না! আমি কিছুতেই এখন মর্তে ফিরা যামু না। যমদূতদের প্রধান আমাকে বললো, বৎস! উত্তেজিত হইও না। তুমি তো জীবিত। জীবিত লোকদের এখানে রাখা হয় না। আমি কইলাম, জীবিত অবস্থায় যখন আমি আইসাই পড়ছি, তখন এই যম রাজ্যটা একবার আমি ঘুরিরা দেইখা তবে যামু। যমদূত প্রধান কইলো, এতো দেখি নাছোড়বান্দা। ঠিক আছে। এক ঘন্টার সুযোগ দিলাম তোমাকে। যাও ঘুরে দেখে এসো। তবে একটি শর্ত আছে। কি শর্ত? শর্ত হলো, তুমি একা একা কোথাও যেতে পারবে না। তোমার সাথে আমাদের চারজন যমদূত থাকবে। আমি হাইসা কইলাম, হে হে হে। হেরা আমার বডিগার্ড থাকবো, তাই তো? যমদূত প্রধান বললেন, হ্যাঁ।

আমি তখনই উইঠা যমরাজ্য ঘুরিরা দেখতে বের হইয়া গেলাম। চারদিক এতো সুন্দর কি কমু তোমারে। রাগ করলো? তুমি কইরা কইলাম দেইখ্যা। আমি বললাম, না না রাগ করবো কেন? আপনিতো আমার গুরুজন। মুরুব্বী। ভানুবাবু বললেন, তা অবশ্য ঠিকই কইছো। তাইলে হুন। বাহিরে বাইর হইয়া দেখি এতো সুন্দর জায়গা যে, আমি বইলা ভাষায় প্রকাশ করতে পারুম না। আমার জীবনে আমি এন্তো সুন্দর জায়গা কোথাও দেখি নাই। সবখানে সুন্দর বাদ্যযন্ত্র বাজতাছে। কত সুন্দর সুন্দর পাখি পশু মানুষের সাথে খেলা করতাছে। গাছে গাছে কত সুন্দর সুন্দর ফুল, ফল পেকে আছে। কেউ কাউরে কিছু বলছে না। আমি এক যমদূতকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ যে হিংস সিংহ, বাঘ, ভালুক মানুষকে খেতে আসে না। যমদূত বললো, বাঘ সিংহ মানুষকে খেতে আসবে কেন? ওরা তো মানুষকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার একটু সখ অইলো। আমি কইলাম, আমি ঐ বড় সিংহটার পিঠে উঠতে চাই। যমদূত ঐ বড় সিংহকে ইশারা করে কাছে ডাকলো, আর সাথে সাথে সিংহটা আমাদের কাছে আইসা বসলো। আমি তো ডরে অজ্ঞান হবার জোগাড়। যমদূত বললো, ভয়ের কিছু নাই। তুমি উঠে বস ওর পিঠে। আমি কাঁপতে কাঁপতে সিংহটার পিঠে উঠে বসলাম। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় গিয়ে দেখি বিরাট একটা মোটা কাঁচের দেয়াল। তার ঐ পাশে মানুষজন চিৎকার চেঁচামেচি করছে। এই পাশ থেকে ঐ সব চিৎকার চেঁচামেচির কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না। দেখেই বুঝা

যায়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর সিংগালা যমদূতেরা তাদের বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিচের দিকে ফেলে দিচ্ছে। আমি ঐ দৃশ্য দেখেই থাকা বললাম, খাড়া খাড়া। এখানে কি অইতাহে? এক যমদূত আমাকে বললো, না না, এখানে দাঁড়ানো যাবে না। এখানে দাঁড়ানো নিষেধ। ঐ দেখেন বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা। আমি বললাম, আমরা জানতেই অইবো এখানে কি অইতাহে। এক যমদূত উত্তেজিত হয়ে বললো, চলুন আপনার সময় শেষ। আমি সিংহের পিঠে বইসাই বললাম, না জাইনা আমি এইখান থেকেই এক পা ও সরল না। কারণ, এখানে আমি আমার পরিচিত সব মানুষজনকে দেখেই ফেলাইছি। তখন এক মোটাশোটা ইয়া বড় গৌফালা যমদূত বললো, ঐটা নরক। আমি বললাম, হায় হায় কয় কি? বিনয়, জন, ফিলিপ, দিলীপ, রিনা, ফুলমতি, পুষ্প, মায়ী ওরা তাইলে নরকে গেছে? ওরা না কত ভালো মানুষ আছিলো। আবার সেই মোটাশোটা যমদূত ধমকের স্বরে আমারে কইলো, আর এক মিনিট সময় আছে। আপনার মর্তে যাবার সময় হয়ে গেছে। চলুন। নতুবা আপনার জন্য আমাদের সাজা পেতে হবে। অগত্যা কি আর

করুম। রাতে ঘুমাইয়া পড়ছিলাম। ভোরে উঠিয়া দেখি আমি আমার বাড়ীর সেই ছাদে শুইয়া আছি।

আচ্ছা দাদা, আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন। আপনার কাছে যমালয় দর্শন লাভের মূল বিষয়টি কি বলে মনে করেন? ভানুবাবু বললেন, দারুণ একটি প্রশ্ন করছেন। দেখুন, এই জগৎটি খুব কঠিন একটি জায়গা। ঘড়ির কাঁটা যে ভাবে চলে মানুষকেও ঠিক সেই ভাবে চলা উচিত বলে আমি মনে করি। আপনার কথাটি আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না দাদা। না বুঝার কিছু বলি নাই তো। পারফেক্টনেস থাকতে হবে সব জায়গাতে। একটু উনিশ/বিশ হলে চলবে না। কারণ, এই নশ্বর পৃথিবীতে আমার বলতে কিছুই নাই। সব ঐ সৃষ্টিকর্তার। আমরা ঐ পৃথিবীতে যে ভাবে এসেছি, আবার সবাই সেই ভাবেই ফিরে যাবো। বিশ্ব বিখ্যাত বীর আলেক্সেজেন্ডারের কথা শুনেছেন তো? তিনি কি করেছিলেন? মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, আমি মারা গেলে রাস্তা দিয়ে যখন আমাকে কবর দিতে নিয়ে যাবে, তখন যেন আমার দুইটি হাত বাহিরে থাকে এবং খোলা থাকে। যেন লোকেরা দেখে

বুঝতে পারে এতো ধন সম্পদের রাজা বীর আলেক্সেজেন্ডার মরার পরে খালি হাতেই চলে যাচ্ছে।

পরদিন বাংলাদেশে ফিরে আসার পথে মৈত্রীট্রেনে বসে বসে ভাবছিলাম। এই জগৎ সংসার কি? একটি পরিবারে আমরা কত সব উৎসব করি। ঘটা করে বাবা-মা সন্তানদের সাথে, আত্মীয় স্বজনদের সাথে উৎসব আনন্দ করি। এই সব উৎসব আনন্দ কি আমরা সবাই একসাথে স্বর্গে গেলেও করতে পারবো? গির্জায় প্রতিটি মিশাতে আমরা প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর আমরা আমাদের কথায়, কাজে, চিন্তায়, অবহেলায় পাপ করেছি। তুমি আমাদের এই সমস্ত পাপ ক্ষমা করো। আসলে কি আমরা মন থেকে এই প্রার্থনাটি করি? মনটা যদি পরিষ্কার না থাকে সর্বদা হিংসা, লোভ, অহংকারে তাড়িত হতে থাকি, তবে আমাদের জন্য নরক নিশ্চিত। কোন লাভ হবে না মরে গেলে জীবিতদের প্রার্থনায়। কারণ, নিজের বিচারে নিজেই ওকালতি করতে হবে। পাপ পুণ্যের হিসাব নিজেই দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যমদূত আমাদের প্রত্যেকেরই দিনপঞ্জির হিসাব রোজ ঠিকই লিখে রাখছেন।

মহাপ্রয়াণে সিস্টার আঞ্জুলিনা মার্তী, সিআইসি

গত ২৯ আগস্ট শান্তি রাণী সংঘ হারিয়েছে তাদের প্রিয়জন প্রবীণ ভগিনী সিস্টার আঞ্জুলিনা মার্তী সিআইসি-কে।

সিস্টার আঞ্জুলিনা মার্তী, সিআইসি-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন : ১ অক্টোবর ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ইণ্ডিয়ার পশ্চিম দিনাজপুরে কালু মার্তী ও কাপু হাঁসদার ঘর আলো করে জন্ম নেয় এক মেয়ে শিশু, যার নাম নাজারিনা। শৈশবকালটা সেখানেই কাটে। তবে মায়ের মৃত্যুর পর তিনি ও তা বোন মামার সাথে বাংলাদেশের দিনাজপুরে এসে পড়াশুনা করতে লিটল ফ্লাওয়ার বোর্ডিং-এ ভর্তি হন। লিটল ফ্লাওয়ার থেকে অষ্টম শ্রেণী পাশ করে সেখানেই শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন এবং শিক্ষকতা চলাকালীন সময়ে সিস্টারদের জীবনযাত্রা ও কাজ দেখে তৃতীয় জীবনে যোগদান করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ব্রতীয় জীবন : শ্রদ্ধেয়া সিস্টার আঞ্জুলিনা মার্তী- ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে শান্তি রাণী সংঘে প্রবেশ করে ১ম ব্রত গ্রহণ করেন ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এবং আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন ৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। পর্যায়ক্রমে ৯ জানুয়ারি, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে রজত জয়ন্তী এবং ১২ নভেম্বর, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেন।

পালকীয় ক্ষেত্রসমূহ: দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে-লিটল ফ্লাওয়ার বোর্ডিং, সেন্ট ফিলিপস প্রাইমারী স্কুল, সুইহারী, বালুবাড়ী, বলদীপুকুর, পাথরঘাটা, নিজপাড়া, ঠাকুরগাঁও, রুহিয়া ও খলিপপুর ধর্মপল্লী এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে-বেনীদুয়ার, চাঁদপুকুর, আন্ধারকোটা, সুরসুনিপাড়া ও মুহিপাড়া ধর্মপল্লী।

বিশেষ গুণাবলী : সিস্টার আঞ্জুলিনা মার্তী গোটা জীবনটাই কাটিয়েছেন সহজ-সরল, বিশ্বস্ত ও ধর্মভীরু ব্রতধারিণী হিসেবে। সদাসর্বদা ঈশ্বর নির্ভরশীল ও প্রার্থনাশীল এই ঈশ্বর সেবিকা অন্যদেরও প্রার্থনা করতে অনুপ্রাণিত করতেন। প্রেরিতিক কাজে নিষ্ঠাবান এবং বাণীপ্রচারে অদম্য এই সহজ সরল সিস্টার সংঘের ক্যারিজম ‘বাণীপ্রচারে’ একনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ প্রেরিতিক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সাধু পৌলের বর্ষে তাঁকে বাণীপ্রচারক হিসেবে ক্রেস্ট দিয়ে পুরস্কৃত করেন। ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় ভারতে পলায়নরত খ্রিস্টানদেরকে গ্রামে থেকে যেতে শক্তি ও সাহস যোগাতেন। পালকীয় কাজে সকল অবস্থাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা এবং প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করে সকলের খোঁজ খবর নেওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। পায়ে হেঁটেই তিনি পালকীয় কাজ করতেন আর অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানের তাঁর ছিল বিশেষ দক্ষতা।

ব্রতীয় জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত বাধ্য ও নম্র। তিনি ছিলেন সর্বদা হাসি-খুশি ও মিশুক এক বিশুদ্ধ মানুষ।

মৃত্যু ঘটনা: ২৯ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মুহিপাড়া ধর্মপল্লীতে ৮৭ বছর বয়সে বাধ্যকর্জনিত কারণে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পরম পিতার একান্ত আশ্রয়ে চলে যান সিস্টার আঞ্জুলিনা মার্তী। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি তার প্রেরিতিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুর দিন সকালে তিনি তার কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন তার ভাল লাগছে না, তাই খ্রিস্টযাগেও যেতে পারেননি। খ্রিস্টযাগ চলাকালীন সময়ে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এ সুন্দর ও প্রশান্তিময় মৃত্যুই তার সুন্দর ও পবিত্র জীবনের সাক্ষ্য বহন করে।

৩০ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডুসহ কয়েকজন পুরোহিত তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং সংঘের সিস্টারগণ সেখানে সমবেত হন। প্রার্থনা করি প্রভু যেন তাঁর এই ভক্তসেবিকাকে চিরশান্তি দান করেন।

-শান্তিরাণী সিস্টারগণ



আলোচিত সংবাদ

ঢাকার যানজট নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

রাজধানীর যানজট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সাতটি নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর অংশ হিসেবে কারওয়ান বাজারের কিচেন মার্কেট গাবতলীতে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শনিবার (২৯/৮) প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাঁর তেজগাঁও কার্যালয়ে এক বৈঠকে তিনি এ নির্দেশনা দেন। বৈঠকে ঢাকা মহানগরীর চলমান যানজট পরিস্থিতি, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ফ্লাইওভারে যানবাহনের চাপ, গণপরিবহন ব্যবস্থাপনা, বাস টার্মিনাল পুনর্বিন্যাস, পার্কিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব শাহাদাৎ হোসেন স্বাধীন বলেন, বৈঠকে এক্সপ্রেসওয়ে (দ্রুতগতির উড়ালসড়ক) ও ফ্লাইওভারের (উড়ালসড়কের) টোল প্লাজাগুলোতে ইটিসি (ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন) সিস্টেম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে টোল আদায় ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, দ্রুত ও প্রযুক্তিনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

<https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/l8sx0kd3gp>

রূপপুরের বিদ্যুৎ আসবে নভেম্বরে

বাংলাদেশের স্বপ্নের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আগামী নভেম্বর মাসে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে আসছে। দেশের প্রথম এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে জাতীয় গ্রিডে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের মধ্য দিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যুগে প্রবেশ করবে জাতি। একই সঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৩তম দেশ হিসেবে পারমাণবিক জ্বালানি ক্লাবে প্রবেশ করবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রটির বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাওয়ার আগে (বি-টু-ধাপে) দুই থেকে তিন সপ্তাহ এবং টারবাইন দিয়ে ৩০% স্ট্রিম তৈরিতে ছয় সপ্তাহ মিলে মোট ৯ সপ্তাহ বা দুই মাস সময় লাগবে। এ হিসেবে আইডিয়াল প্রোগ্রাম যদি অনুসরণ করা হয়, তা হলে আগামী নভেম্বর মাসে উৎপাদনে আসবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট পারমাণবিক বিদ্যুতের উৎপাদন খরচসহ বিদ্যুতের মূল্য দাঁড়াবে ১০ টাকার কম। তবে পারমাণবিক চুল্লিতে ব্যবহৃত জ্বালানি বা স্পেন্ট ফুয়েল বিষয়ে এখনো রাশিয়া সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপন্ন অন্যান্য ভারি বর্জ্য

আলাদাভাবে সংরক্ষণের বিষয়েও কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় বিশেষজ্ঞ মহলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে ২৪ লাখ ডলারের চিকিৎসা সরঞ্জাম দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশে মাতৃ-নবজাতক-শিশুস্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ২৪ লাখ মার্কিন ডলারের (২৯ কোটি ৩২ লাখ ৮০ হাজার টাকা) চিকিৎসা সরঞ্জাম-উপকরণ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার (৩১/৮) ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র পূর্ণিমা রাইয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর এই সহায়তার মধ্যে রয়েছে নবজাতকের শরীর উষ্ণ রাখার ও শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়তাকারী সরঞ্জাম। গুরুতর অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য থেরাপিউটিক ফুড। টিকার কার্যকারিতা বজায় রাখার উপকরণ। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে এফএইচআই ৩৬০, জেপিগো, জেএসআই ও ইউনিসেফের মাধ্যমে এসব সরঞ্জাম-উপকরণ দুর্গম এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

<https://www.prothomalo.com/bangladesh/0tgc7cg8g>

নেপালের ভয়াবহ বন্যায় যেসব চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে

গত ২৬ আগস্ট দেশটিতে ভয়াবহ বন্যায় এখন পর্যন্ত ১১২৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ভাটির দিকে চিতওয়ান পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে উদ্ধার অভিযান চলায় হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এবারের বন্যা সরাসরি কোনো প্রচলিত হিমবাহ হ্রদ ফেটে যাওয়ার কারণে হয়নি। প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলছে, লেভে উপত্যকার প্রায় ৫ হাজার ২০০ থেকে ৫ হাজার ৪০০ মিটার উচ্চতায় একটি বিশাল হিমবাহের অংশ ধসে পড়ে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়। ধসে পড়া বরফ ও পাথরের পরিমাণ ১০ কোটি থেকে ২০ কোটি ঘনমিটার হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিপুল বরফ-পাথর উপত্যকার তলদেশে আছড়ে পড়ে পানি, পলি ও বড় পাথর ভাটির দিকে প্রবল বেগে ঠেলে দেয়। স্যাটেলাইট চিত্র ও ভূকম্পনসংক্রান্ত তথ্যও হিমবাহ ধসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, দীর্ঘমেয়াদি ঢাল অস্থিতিশীলতা ও টেকটোনিক সক্রিয়তা এ ঘটনার পেছনে ভূমিকা রেখেছে।

অন্যদিকে, নেপালে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে হাজারের বেশি মানুষের

প্রাণহানির মধ্যে নুয়াকোট জেলার ত্রিভুবন ত্রিশূলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজেন্দ্র দাওয়াদি ৯০০ শিক্ষার্থীর জীবন বাঁচিয়ে আলোচনায় এসেছেন। স্থানীয় সময় বুধবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে পরপর চারটি ফোনকল পেয়ে তিনি দ্রুত দুর্যোগের ভয়াবহতা বুঝতে পারেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দ্রুত উঁচু স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং স্কুলমুখী শিক্ষার্থীবোঝাই বাসগুলোকে ফিরে যেতে বলেন। তাঁর তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাত্র ১০ মিনিট পরই পাহাড়ি ঢলের পানি স্কুলে আঘাত হানে। রাজেন্দ্র জানান, আরও কয়েক মিনিট দেরি হলে তাঁর সঙ্গে শিক্ষার্থীদেরও হয়তো আজ কথা বলা সম্ভব হতো না। এদিকে দেশটির ভয়াবহ দুর্যোগের শক্তি নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক বসন্ত রাজ অধিকারীর মতে, হিমবাহ ধসে সৃষ্ট এই জলস্রোতের শক্তি জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত পরমাণু বোমার চেয়েও বেশি ছিল। তাঁর মতে, এটি ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ভারতের চামোলি বিপর্যয়ের তুলনায়ও ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

জাতীয় দল থেকে অবসর যাচ্ছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি

আর্জেন্টিনা জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি। সোমবার (৩১ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন পোস্টে ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়ের সিদ্ধান্ত জানান। মেসি বলেন, বিশ্বকাপ ফাইনালের পর অনেক ভেবেচিন্তে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জাতীয় দলের জার্সির জন্য ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, সিদ্ধান্তটি তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টের হলেও এখনই সরে দাঁড়ানোর উপযুক্ত সময়। মেসি আরও বলেন, জাতীয় দলের হয়ে খেলা তিনি ভালোবেসেছেন এবং ভবিষ্যতেও ভালোবাসবেন। তবে নতুন প্রজন্মের অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসায় তাদের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। দীর্ঘ ২০ বছরের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান তিনি। পাশাপাশি পরিবার, কোচ, সতীর্থ ও কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জাতীয় দল থেকে সরে দাঁড়ালেও বাইরে থেকে সবসময় আর্জেন্টিনাকে সমর্থন ও উৎসাহ দিয়ে যাবেন বলে জানান মেসি। বিদায়বার্তার শেষে তিনি আর্জেন্টিনার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে বলেন, ‘এগিয়ে যাও আর্জেন্টিনা।’

<https://www.jugantor.com/sports/1147899>



ছোটদের আসর

পঞ্চতন্ত্রের গল্প: ব্রাহ্মণ ও তিন ডাকাত

একবার এক ব্রাহ্মণ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর উপহার হিসেবে একটি ছাগল পেলেন। ব্রাহ্মণ ছাগলটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

ঘটনাচক্রে তিনজন ডাকাত ব্রাহ্মণটিকে ছাগলটি নিয়ে যেতে দেখে ফেলল।

তারা খুব ক্ষুব্ধ ছিল। ছাগলটা দেখে প্রথম ডাকাতটি বলে উঠল, “ওহ! কী মোটাসোটা ছাগল! আমাদের এই ছাগলটা ধরা উচিত।”

দ্বিতীয়জন বলল, “হ্যাঁ, এটা আমাদের তিনজনের জন্য খুব ভালো একটা খাবার হবে।”

“কিন্তু আমরা ছাগলটা কী করে পাব? ব্রাহ্মণ তো ছাগলটা কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো মনে হয় উনি আমাদের এটা উপহার দেবেন না”, বলল তৃতীয়জন।

“আমি জানি কীভাবে ওই ছাগলটাকে কাবু করতে হয়। আমার একটা পরিকল্পনা আছে”, বলল প্রথম ডাকাতটা, “আমার কথা শোনো”।

সে বাকি দুজনের কানে পরিকল্পনাটা ফিসফিস করে বলল। তারা ব্রাহ্মণকে বোকা বানিয়ে ছাগলটা নিজেদের জন্য হাতিয়ে নেবে।

তারা রাস্তার ধারের গাছগুলোর আড়ালে মাথা নিচু করে ব্রাহ্মণটির পাশ দিয়ে চলে গেল, আর পুরোটা সময় খেয়াল রাখছিল যেন ব্রাহ্মণটি তাদের দেখতে না পায়।

কিছুক্ষণ পরে, ডাকাতদের একজন ব্রাহ্মণের কাছে এগিয়ে এল।

“ওহে! ধার্মিক পুরোহিত,” প্রথম ডাকাতটা বিনীতভাবে বলল, “আমি দেখছি আপনি কাঁধে একটা কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারছি না আপনার মতো একজন ধার্মিক ব্যক্তি কেন কাঁধে একটা কুকুর নিয়ে ঘুরবেন।”

“তোমার চোখ নেই?” ব্রাহ্মণটি গর্জে উঠল, “তুমি দেখতে পাচ্ছ না এটা একটা ছাগল, কুকুর নয়। একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান অত্যন্ত ভালোভাবে সম্পন্ন করার পুরস্কার হিসেবে আমি এটি পেয়েছি।”

“ক্ষমা করবেন মহাশয়, কিন্তু আমি শুধু তাই বলছি যা আমি নিজের চোখে দেখছি। আমি আর কিছু বলব না”, বলল প্রথম ডাকাতটা।

“স্পষ্টতই, উচ্চশিক্ষিত হওয়াই সবকিছু নয়!”, যাওয়ার আগে ডাকাতটি বিড়বিড় করে বলল, এবং খেয়াল রাখল যেন ব্রাহ্মণটি শুনতে পায়।

ব্রাহ্মণটি লোকটিকে তার চরম মূর্খতার জন্য অভিশাপ দিতে দিতে নিজের পথে চলতে থাকলেন।

তিনি একশো মিটারও হাঁটেননি, এমন সময় দ্বিতীয় ডাকাতটা তাঁর কাছে এসে



বলল, “মহাশয়, আপনি এই মৃত বাছুর কোথায় পেলেন এবং কেন এটি কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন? একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে মৃত পশু বহন করা কি লজ্জাজনক নয়?”

একথা শুনে ব্রাহ্মণটি রেগে গেলেন। তিনি দ্বিতীয় বদমাশটির দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড রাগে চোঁচিয়ে বললেন, “সবার কী হচ্ছে? কিছুক্ষণ আগে দেখা হওয়া অন্য বোকাটার মতো তুমিও কি অন্ধ? আমি যেটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেটা কোনো মরা বাছুর নয়। এটা একটা ছাগল; যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে পেয়েছি।”

ডাকাতটি নির্দোষিতার ভান করেছিল।

“মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যা দেখছি, তা আপনাকে জানিয়ে রাখাই আমার কাজ। আপনি একটি মৃত বাছুর বহন করুন বা একটি জীবন্ত ছাগল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন”, এই বলে সে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে চলে গেল।

ব্রাহ্মণটি এবার কিছুটা হতবাক হলেন। ওটা সত্যিই ছাগল কি না, তা নিশ্চিত হতে তিনি প্রাণীটির দিকে একবার তাকালেন এবং নিজের যাত্রা পুনরায় শুরু করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই, পরিকল্পনা অনুযায়ী, তৃতীয় ডাকাতটির আবির্ভাব ঘটল।

ব্রাহ্মণকে দেখে সে ভ্রুকুটি করে বলল, “মাফ করবেন মহাশয়, আপনি কি আসল ব্রাহ্মণ?”

“হ্যাঁ, আমি তাই। এটা কেমন ধরনের প্রশ্ন?” ব্রাহ্মণটি পাল্টা জবাব দিল।

তাহলে, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনার মতো একজন সাধুপুরুষ কী করে কাঁধে একটি শূকর বহন করার সাহস করেন? আপনার মতো সাধু ব্যক্তির এই পশুটিকে স্পর্শ করাই উচিত নয়, কাঁধে বহন করা তো দূরের কথা।

ব্রাহ্মণটি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

পথে তার সাথে দেখা হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাঁধে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী দেখেছিল। প্রথমজন দেখেছিল একটি কুকুর, দ্বিতীয়জন একটি মৃত বাছুর এবং এখন একটি শূকর।

“যদি আমি কোনো রূপ বদলাতে পারি এমন কোনো দৈত্য বহন করি?”, ভাবল ব্রাহ্মণ।

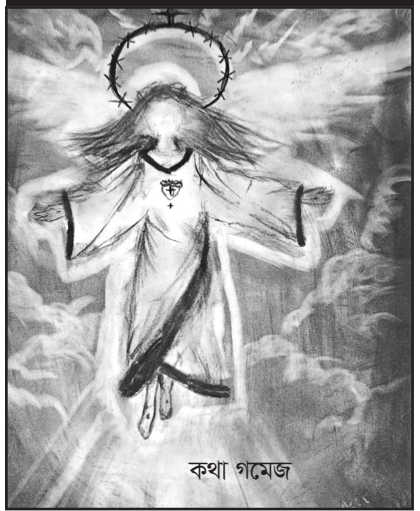
এতক্ষণ ধরে একটা দৈত্যকে কাঁধে বয়ে বেড়ানোর কথা ভাবতেই ব্রাহ্মণের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। প্রাণভয়ে সে তৎক্ষণাৎ ছাগলটাকে নামিয়ে দিয়ে যত জোরে পারল দৌড়ে বাড়ি চলে গেল।

ডাকাতটা তার বন্ধুদের ডাকল। তারা ছাগলটা তুলে নিয়ে জায়গাটা ছেড়ে চলে গেল, আর সারাক্ষণ সেই ব্রাহ্মণের কথা বলতে থাকল, যাকে তারা কত সহজে বোকা বানিয়েছিল।

নীতিবাক্য: সাধারণ জ্ঞান ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত পুঁথিগত জ্ঞানই অকেজো।

সংগ্রহে:- ইন্টারনেট

কেমন তোমার ছবি ঐকেছি!



কথা গমেজ



তারুণ্যের জাগরণ ও নেতৃত্ব বিকাশে ধরেভায়া ওয়াইসিএস দিবস উদ্‌যাপন



পিংকু লিনুস ক্রুশ: গত ২৯ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে সেবার চেতনায় তারুণদের জাগিয়ে তোলার এক সুন্দর ও অর্থবহ প্রয়াস নিয়ে সেন্ট যোসেফস ওয়াইসিএস ইউনিট, ধরেভায়া, সাভারে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে YCS Day প্রথমবারের মত উদ্‌যাপিত

হয়। এতে প্রায় ২৮০ জন ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। এবারের মূলভাব ছিল “জাগি আমরা-জাগাই ওয়াইসিএস”। YCS-এর SEE-JUDGE-ACT পদ্ধতির আলোকে দিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আগমন, রেজিস্ট্রেশন, আনন্দ র্যালি ও টিফিনের মাধ্যমে

অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানো হয়। পরবর্তীতে ধরেভায়া ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার অমল টি. ব্রুজ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ YCS-এর যুব কো-অর্ডিনেটর ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ব্রুজ কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করেন।

“জাগি আমরা, জাগাই ওয়াইসিএস-একসাথে শিখি, নেতৃত্ব দেই, সেবা করি” শীর্ষক পর্বে এপিসকোপাল যুব কমিশন নির্বাহী সচিব ফাদার বিকাশ রিবেক্স অংশগ্রহণকারীদের অনুপ্রেরণামূলক সেশন পরিচালনা করেন। এছাড়া ফ্লোবিয়ান ডিক্সা “আমার YCS Journey: অভিজ্ঞতা থেকে আত্মগঠন” বিষয়ে আলোচনা করেন। এপিসকোপাল যুব কমিশনের সেক্রেটারি সিস্টার সুজলা হাসদা সেলমিটিং অনুশীলন পরিচালনা করেন।

পরবর্তীতে দলীয় গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন আনন্দঘন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দিনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শেষে সেন্ট যোসেফস হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ধরেভায়া প্রিন্সিপাল সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সার্বিকভাবে, দিনব্যাপী এই আয়োজন ছিল ঐক্য, নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ সম্পর্কে জাগরণ সৃষ্টি করা।

পোস্ট এইচএসসি খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ ২০২৬



বেনেডিক্ট: গত ২০-২৫ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে পোস্ট এইচএসসি খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই সকল অংশগ্রহণকারী, ফাদার-সিস্টার ও এ্যানিমেটরসহ সকলকে মিষ্টি খাওয়ানোর মধ্যদিয়ে এ কোর্সে উদ্ভোধন করা হয়।

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার আস্তনী হাঁসদা কর্মশালার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। উক্ত প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন ফাদার উইলিয়াম মুরু ও ফাদার শ্যামল জেমস গমেজসহ আরও কয়েকজন সন্যাসব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ। এ কোর্সে ফাদার-সিস্টার, এনিমেটর ভলেন্টিয়ারসহ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ ও জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লী হতে ১৪৫

জন অংশগ্রহণ করে। এ কোর্স আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো বর্তমান বাস্তবতার মাঝেও যুব সমাজ যেন পথভ্রষ্ট না হয় বরং খ্রিস্টের সাথে যুক্ত থেকে পবিত্র জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। “মিলন সাধনা, সংহতি ও বাণী প্রচারে যুব সমাজ; আমার ভালবাসার আশ্রয়ে থেকো” এই মূলসূরের উপর ভিত্তি করে কোর্স পরিচালনা করা হয়। এতে বিভিন্ন প্রফেসর, ফাদার ও সিস্টারগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন। উক্ত কোর্সে পবিত্র বাইবেল; শিষ্যচরিত ও পত্রসমূহ, ক্যাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস, পারিবারিক জীবন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও উচ্চতর শিক্ষা, বিশ্লেষণ পদ্ধতি: যুব নৈতিকতা-মূল্যবোধ, চ্যালেঞ্জ ও আমাদের করণীয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। পরিশেষে ২৫ তারিখ দুপুরে ফাদার পিউস গমেজের সমাপনী খ্রিস্টযাগ ও সকল অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার বিতরণী এবং সনদপত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে কোর্সের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ে নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

সিস্টার রুলিটা খালকো: গত ২৮ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও বোণী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত সেন্ট লুইস

উচ্চ বিদ্যালয়ে নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আশীর্বাদ প্রার্থনা করার পর বিশপ মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং

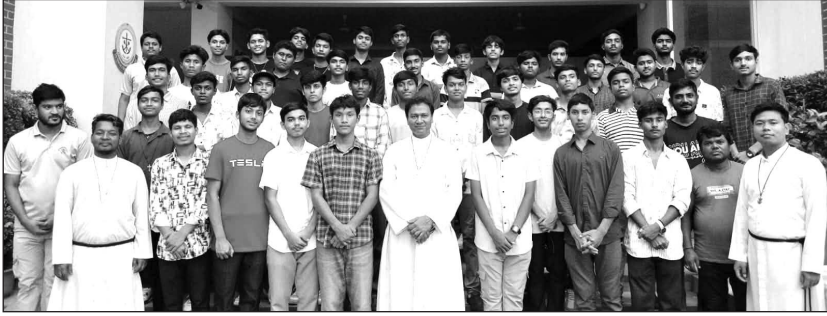
নতুন ভবন নির্মাণ কাজে জড়িত সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের এই মাহেন্দ্রক্ষেপে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নির্মাণ/উন্নয়ন কাজ তদারক নিয়োজিত ফাদার



উইলিয়াম মুর্রু (ডেভেলপমেন্ট অফিসার), রাজশাহী কারিতাস অঞ্চলের আঞ্চলিক ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মার্ভী, পরিচালক মি. আরোক টপ্য, রাজশাহী

পবিত্র ত্রুশ সংঘের ব্রাদারদের 'এসো, দেখে যাও' প্রোগ্রাম



ব্রাদার শিমিয়ন এস. রংথং সিএসসি: 'এসো, আমাকে অনুসরণ কর।' (মথি ৪: ১৯ পদ)- এই মূলভাবের উপর ভিত্তি করে বিগত ১৬ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মরিয়ম আশ্রম, দিয়াং-এ অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র ত্রুশ সংঘের ব্রাদার সমাজের আয়োজিত 'এসো, দেখে যাও' অনুষ্ঠান। ১৬ জুন থেকে ১৭ জুলাই প্রায় একমাস মেয়াদকালীন এই প্রোগ্রামে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ৪৫জন পোস্ট এসএসসি ছাত্র অংশগ্রহণ করে। পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন

ব্রাদার শৈলেন জাখারিয়াস রোজারিও সিএসসি ও ব্রাদার শিমিয়ন সিলভেস্টার রংথং সিএসসি এবং ব্রাদার সোহেল পিটার মন্ডল সিএসসি। ১৬ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টাগের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রামটি শুভ উদ্বোধন হয়। অতঃপর পবিত্র খ্রিস্টাগে পৌরহিত্য করেন মরিয়ম ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার জাস্টিন টমাস এসভিডি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসব্রতধারী। একমাস জুড়ে অবস্থানরত ছাত্রদের বিভিন্ন ক্লাস, কাজ-কর্ম,

খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার সাগর কোড়াইয়া, বোথী ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার বাবলু কোড়াইয়া, সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফাদার উত্তম রোজারিও, ফাদার শ্যামল গমেজ ও ইঞ্জিনিয়ার মনির হোসেনসহ প্রমুখ গণ্যমান্য অতিথিবর্গ। উল্লেখ্য, গত ২৭ আগস্ট, ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মার্ভী, ফাদার উইলিয়াম মুর্রু, ফাদার বাবলু কোড়াইয়া ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণের উপস্থিতিতে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নতুন বিদ্যালয় ভবনের কাজ উদ্বোধন করা হয়।

প্রার্থনা, খেলাধুলা, সহভাগিতা, শিক্ষাসফর, আধ্যাত্মিক পাঠের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসব্রতী জীবনের আশ্রান বুঝতে সর্বাত্মক সাহায্য করা হয়। অনেক ব্রাদার, সিস্টার ও ফাদারগণ এবং রিসোর্স পার্সনের ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়; যেখানে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং পবিত্র ত্রুশ সংঘের আধ্যাত্মিকতা, ক্যারিজম ও ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রোগ্রামের সমাপ্তিতে খ্রিস্টাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার রিগ্যান কস্তা, ফাদার মারিয়াস এসভিডি, ফাদার ভান্ডুস এসভিডি ও ফাদার জাস্টিন টমাস এসভিডি। অতঃপর ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। পরিশেষে, ব্রাদার সুমন যোসেফ কস্তা সিএসসি (হাউজ সুপিরিওর) ও সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের প্রদেশপাল ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি এবং ব্রাদার শৈলেন জাখারিয়াস রোজারিও সিএসসি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অনুভূতি সহভাগিতা করেন। উক্ত দিবসে সেন্ট প্লাসিড স্কুল এন্ড কলেজ এবং চট্টগ্রামের বিশপস হাউজ পরিদর্শন ও খ্রিস্টাগ এবং রাতে আহ্বারের পর "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

সন্ন্যাস ব্রতধারী ও ব্রতধারিনীদের মিলনমেলা-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ



ব্রাদার এলভিস জিনিয়াস গমেজ সিএসসি: গত ৬ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের সন্ধ্যা থেকে ৮ আগস্ট দুপুর পর্যন্ত সাভারের বিসিআর সেন্টারে সাময়িক সন্ন্যাসব্রতধারী ও ব্রতধারিনীদের জন্য একটি বিশেষ গঠনমূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। "খ্রিস্টেতে শক্তিশালী ও আশায় নবীকৃত হই"-এই মূলভাবের উপর ভিত্তি করে ইনিশিয়াল ফরমেশন সাব-কমিটির উদ্যোগে

আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মসংঘের ৬১ জন সিস্টার, ব্রাদার ও সেমিনারিয়ান অংশগ্রহণ করেন।

সন্ধ্যায় পবিত্র খ্রিস্টাগের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই খ্রিস্টাগ উৎসর্গ করেন। পরে পরিচিতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হন।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক নবায়ন, পারস্পরিক পরিচিতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি এবং খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার প্রচারে একে অপরের পাশে থাকার চেতনা গড়ে তোলা। সিস্টার মারিসা পিমে, ফাদার প্রণয় আন্তনি গমেজ সিএসসি এবং ব্রাদার তপন লরেন্স ছেরাও সিএসসি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সহভাগিতা করেন। সহভাগিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের আশ্রান-জীবনের সৌন্দর্যকে নতুনভাবে আবিষ্কার, দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও আত্মীয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এছাড়া দলীয় আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মূল্যায়ন পর্বও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮ আগস্ট ফাদার বিশুজিৎ বর্মন সমাপনী খ্রিস্টাগ উৎসর্গ করেন। পরিশেষে আশ্বায়ক ব্রাদার তপন লরেন্স ছেরাও সিএসসি'র সমাপনী বক্তব্য ও দুপুরের আহ্বারের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

সিডিআর/২০২৬-২৭/৫৫৮

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

০২/০৯/২০২৬

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেন্টলিটির অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৮ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপ:

বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১) পদের নাম: ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি) বয়স: ২২-৩৫ বছর (৩১/০৭/২০২৬ খ্রি: অনুযায়ী) পদের সংখ্যা: ১০ টি বেতন: শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার টাকা)। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন: পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্সুরেন্স স্কীম, হেলথ কেয়ার স্কীম ও বছরে দু'টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে। চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী ছুটি প্রাপ্ত সুবিধা থাকবে।	- এইচ.এস.সি পাশ বা সমমান পাশ, তবে স্নাতক পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। - অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। তবে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। - গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। - আদর্শবান, সং চরিত্রের অধিকারী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হতে হবে। - কর্ম এলাকায় বাই-সাইকেল/মোটর সাইকেল চালাতে হবে।
২) পদের নাম : কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি) পদ সংখ্যা : ০৫ টি বয়স : ২২-৩৫ বছর (৩১/০৭/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) বেতন : সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/- (বারো হাজার) টাকা। (চুক্তিভিত্তিক)	- ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। - রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। - মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

■ কর্মস্থল: মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, নরসিংদী সদর এবং রায়পুরা উপজেলা।

■ তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ প্রদানসহ মেথার ক্রমানুসারে প্যানেলভুক্ত করে রাখা হবে যা, পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি) এর সংক্ষিপ্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ:

- প্রার্থীকে ১৮-২০ টি নিয়মিত সমিতি এবং ৪০০-৫০০ জন নিয়মিত সদস্য নিয়ে কাজ করতে হবে। ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় ১০০% নিশ্চিত করা।
- সমিতি থেকে আদায়কৃত সঞ্চয় এবং ঋণের কিস্তি ব্রাঞ্চ অফিসে দৈনিক ভিত্তিতে জমা দেয়া। ঋণের আবেদন ফরম পূরণ ও ঋণ বিতরণের জন্য সুপারিশ করা।
- সদস্যদের পাস বই ও সমিতির রেজুলেশন নিশ্চিত করা। প্রার্থীকে যোগাযোগ দক্ষতা ও স্মার্ট মোবাইল ফোন চালানোর পারদর্শী হতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী :

- ক) প্রার্থীর নাম, খ) পিতা/স্বামীর নাম, গ) মাতার নাম, ঘ) জন্ম তারিখ, ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা, চ) স্থায়ী ঠিকানা, ছ) মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল নম্বর, জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, বা) ধর্ম, ঞ) জাতীয়তা, ট) বৈবাহিক অবস্থা, ঠ) দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা (মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল এড্রেসসহ) এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখসহ সাদা কাগজে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে লিখিত আবেদন করতে হবে।
- আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) এর ফটোকপি, চারিত্রিক সনদপত্র ও সদ্য তোলা দুই (২) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, চাকুরীর অভিজ্ঞতা সনদপত্রের ফটোকপি (যদি থাকে) জমা দিতে হবে।
- চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র সংযোজন করে আবেদন করতে হবে।
- যারা বর্তমানে পড়াশোনা করছেন (ছাত্র/ছাত্রী) এবং ধূমপান বা নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।
- নির্বাচিত প্রার্থীকে ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প' প্রার্থীর নিজ গ্রাম বা এলাকার দুইজন গণ্যমান্য (সরকারী চাকুরীজীবী অথবা সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত) ব্যক্তিকে 'প্রার্থী কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম হলে তার দায়ভার বহন করতে সম্মত রয়েছেন'-মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।
- নির্বাচিত ক্রেডিট অফিসার প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসাবে নিয়োগ দেয়া হবে, যা প্রয়োজনে আরও ৩ (তিন) মাস বাড়ানো হতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করলে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে।
- ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।
- প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য ও সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত (Short Listed) প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে/মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- আবেদনপত্র আগামী ১৭/০৯/২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে খামের উপর পদের নাম উল্লেখসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
- ক্রেডিটপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
- নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ ঢাকা অঞ্চল, ১/সি, ১/ডি পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।

“কারিতাস বাংলাদেশ কর্মী নিয়োগে অম-সুযোগদানে বিশ্বাসী”



কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরনের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূন্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভুক্ত হবে।



বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সন্মানিত সুধী,

ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপাসনালয় পরিষদ'র পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আসছে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপাসনালয় প্রাঙ্গণে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা, ভক্তিপূর্ণ ও আনন্দময় পরিবেশে আর্শিবাদিত খিচুড়ীসহ ২৫ বছরের রজত জয়ন্তীর বর্ষে আরোগ্যদায়িনী মাতা ভেলেংকিনী মা মারীয়ার পর্বোৎসব-২০২৬ উদযাপন করা হবে।

অতএব, ২৫ বছরের রজত জয়ন্তীর এই শুভলগ্নে আরোগ্যদায়িনী মাতা ভেলেংকিনী মা মারীয়া'র আর্শিবাদ লাভের জন্য আপনাদের পর্বোৎসবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণসহ নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।



অনুষ্ঠানসূচী

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার হতে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার পর্যন্ত
প্রতিদিন সময়: বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য নভেনা প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে।
১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার হতে ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বুধসপ্তিমবার পর্যন্ত
সময়: বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় নভেনা প্রার্থনা ও বিশেষ প্রস্তুতি খ্রিস্টমাগ অনুষ্ঠিত হবে।

পর্বীয় খ্রিস্টমাগ

১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার সময়: সকাল ১০:০০ ঘটিকায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: নভেনা ও পর্বীয় খ্রিস্টমাগের উদেশ্য প্রার্থনা: ২০০/- টাকা ও পর্বকর্তা: ৫০০/- টাকা ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও যারা অন্যান্য অনুদান ও সহযোগিতা করতে চান তা সাদরে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে

বিভিন্ন তথ্য ও সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন:

★ মি. প্রদীপ বেঞ্জামিন রোজারিও
সহ-সভাপতি, সাফাজেউ
মোবাইল নং: ০১৭৭০-৪৩৫২৫৩

★ মি. লেনার্ড যোসেফ পিউরীফিকেশন
সহ-সেক্রেটারি, সাফাজেউ
মোবাইল নং: ০১৭৫১-০৩১৯৭৮

★ মি. জ্যোতি বার্গার্ড রোজারিও
কোষাধ্যক্ষ, সাফাজেউ
মোবাইল নং: ০১৭৫৭-৯২৯১৮০

★ মি. বিকাশ রোজারিও
যুব বিষয়ক সম্পাদক, সাফাজেউ
মোবাইল নং: ০১৭৭১-৩৭১১৭৮

★ মি. বিনয় রোজারিও
প্রাক্তন সহ-সভাপতি, সাফাজেউ
মোবাইল নং: ০১৭১৫-২৫৩৭৮৬

★ মি. রবি বার্গার্ড ডেজ. রোজারিও
প্রাক্তন সহ-সভাপতি, সাফাজেউ
মোবাইল নং: ০১৭১২-০৭০৯০৩

★ মি. উইলসন স্টিফেন রিবেক
প্রাক্তন সেক্রেটারি, সাফাজেউ
মোবাইল নং: ০১৭১৫-৪৩১৯১৫

★ মি. স্ট্যানিসলাস সোহেল রোজারিও
প্রাক্তন সেক্রেটারি, সাফাজেউ
মোবাইল নং: ০১৭১৭-০০৪০৫৮

★ মি. রিচার্ড ফ্রান্সিস রোজারিও
প্রাক্তন সেক্রেটারি, সাফাজেউ
মোবাইল নং: ০১৭১০-৫৭২০০৩

★ মি. ব্যাকসল আলফল পিউরীফিকেশন
সভাপতি, মঠবাড়ী খ্রিস্টান যুব সমিতি
মোবাইল নং: ০১৮৮৮-৭৯২৫৫৫

★ মি. স্পন্দন জাস্টিন গমেজ
সভাপতি, ভাসানিয়া জয়ন্ত যুব সংঘ
মোবাইল নং: ০১৭২৬-৭০১১০৯

আমেরিকা প্রতিনিধি

মি. ডেজমন্ড রোজারিও
০০১২৪০৫২৫৩৭৮৫

ইউরোপ প্রতিনিধি

মি. আন্দ্রাইট রোজারিও
০০৩৩০৭৫১০২৬৪৫৩

Stobintz

ফাদার সুরত বনিফাস টলেস্তিন, সিএসসি
সভাপতি

ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপাসনালয় পরিষদ
পাল-পুরোহিত, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী
ভাসানিয়া, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
মোবাইল নং: ০১৭১৫-০৯১০৯৩

ধন্যবাদান্তে,

লিংকার্স বি' রোজারিও
সেক্রেটারি

ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপাসনালয় পরিষদ
ভাসানিয়া, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
মোবাইল নং: ০১৭২২-৪৪৭১৯৫

বিজ্ঞ/১৭২/২৬

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ)

বাৎসরিক সাধারণ মিলন-সভা
এবং বিডিপিএফ রুবি জুবিলী উৎসব

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ এ বছর এর ৪০ বছরের রুবি জুবিলী উৎসব উদযাপন করছে। রুবি পাথর যেমন শক্ত ও মূল্যবান তেমনি রুবি জুবিলী পালন হলো দীর্ঘস্থায়ী অঙ্গীকার, বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের প্রতীক। বিডিপিএফ-এর প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে যাজকদের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ববোধের যাত্রা, সংগ্রাম ও অর্জনগুলোর স্মরণ উৎসব। এই যাজক ভ্রাতৃসংঘ টিকে থাকা এবং এর ক্রমবিকাশে ঈশ্বরের করুণা ও অনেকের নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। যারা প্রথম থেকে এযাবৎ কাল পর্যন্ত পরম্পরাগতভাবে এর হাল শক্ত ও দৃঢ়ভাবে ধরে তা বয়ে এনেছেন তাদের প্রতি আমরা চির কৃতজ্ঞ এবং তাদের প্রতি রইল আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা।

উৎসবের মূলসূর হলো



রুবি জুবিলী : 'ভ্রাতৃপ্রেমের উৎসব - মিলন-একতা এবং
যাজকীয় প্রেরণ সেবাকর্মে বৃদ্ধিলাভ'

বাৎসরিক মিলন সভা:

📍 স্থান: আচবিশপস্ হাউজ, রমনা, ঢাকা
📅 তারিখ ৬-৭ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

জুবিলী উৎসব উদযাপন:

📍 স্থান: জপমালা রাণী গীর্জা, তেঁজগাও
📅 তারিখ ৮ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার
🕒 পবিত্র খ্রিস্টমাগ : ৮:৩০ সকাল

ফাদার মিকু লরেন্স পালমা
প্রেসিডেন্ট, বিডিপিএফ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেক
সেক্রেটারী, বিডিপিএফ

বিজ্ঞ/১৭৪/২৬

ফাতেমা রাণীর তীর্থে আমন্ত্রণ

সম্মানিত সুধী,

বারমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান থেকে সবাইকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আসছে **২৯-৩০ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ**, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করা হবে। এ বছরের মূলসূর:

“মানবতার জননী: ফাতেমা রাণী মা মারীয়া”।

আপনারা যারা পর্বকর্তা হতে চান, পবিত্র খ্রিস্টিয়াগে উদ্দেশ্য ও তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য অনুদান দিতে আগ্রহী, **আপনারা নিম্নে উল্লেখিত নম্বরগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। পর্বকর্তা সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, পবিত্র খ্রিস্টিয়াগের উদ্দেশ্যে সর্বনিম্ন ২০০ টাকা।**

মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

খ্রিস্টেতে

ফাদার তরুণ বনোয়ারী (সমন্বয়কারী)

বারমারী ফাতেমা রাণী তীর্থ কার্যকারী কমিটি



ফাদার তরুণ বনোয়ারী

০১৯১৬-৪২৪৪৩৮



ফাদার নরবার্ট গমেজ

০১৬১৮-৩৪৩৬২৭



অনুষ্ঠানসূচী

অক্টোবর ২৯, ২০২৬

পূর্ণমিলন/পাপস্বীকার : দুপুর ০২:০০ মিনিট
পবিত্র খ্রিস্টিয়াগ : বিকাল ০৪:০০ মিনিট
জপমালার আলোর শোভাযাত্রা : রাত ০৮:০০ মিনিট
সাক্রামেন্টের আরাধনা ও আলোর শোভাযাত্রা : রাত ১১:৩০ মিনিট

অক্টোবর ৩০, ২০২৬

জীবন্ত ত্রুশের পথ : সকাল ০৮:০০ মিনিট
মহাখ্রিস্টিয়াগ : সকাল ১০:০০ মিনিট

আসুন, সবাই মিলে - ফাতেমা রাণীর আশীর্বাদে ধন্য হই।